বঙ্গ
কমলবার্তা
নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৩। মূল্য ২৫ টাকা

তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়

শাহী জনসভায় জনপ্লাবন

রেশন চুরিতে জেলে মমতা ঘনিষ্ঠ বালু

আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ

বাঙালির কালীপুজো

ছট পুজোয় বাঙালি-বিহারী বিভেদ নেই

বহিষ্কৃত মহুয়া

অধরা বিশ্বকাপ

তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের পর, নয়াদিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বিজয় উৎসব।

ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর জনসভায় জনসমুদ্র।

বঙ্গ
কমলবার্তা

নভেম্বর সংখ্যা। ২০২৩

নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ ৪
বাংলায় অনুবাদ অভিজিৎ দাস ববি

তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়, কলকাতায় শাহী সভায় জনপ্লাবন ৮
অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনামূল্যে মোদীর রেশন চুরির দায়ে রাজ্যের মন্ত্রী জেলে ১০
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

মাথা ব্যথার নাম মহুয়া ১২
স্বাতী সেনাপতি

অধরা বিশ্বকাপ দিয়ে গেল অনেক কিছু ১৫
অভিরুপ ঘোষ

ছবিতে খবর ১৮

গণিতজ্ঞ আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ ২৪
বিনয়ভূষণ দাশ

বাঙালির কালীপূজা ২৭
কৌশিক কর্মকার

ছট পূজা সকল ভারতীয় হিন্দুব সূর্য উপাসনা ৩০
সৌভিক দত্ত

ফেক নিউজ ৩৩

সম্পাদক: জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
কার্যনির্বাহী সম্পাদক : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়
সহযোগী সম্পাদক : জয়ন্ত গুহ
সম্পাদকমন্ডলী:
অভিরূপ ঘোষ, কৌশিক কর্মকার, উজ্জ্বল সান্যাল, অনিকেত মহাপাত্র
সার্কুলেশন: সঞ্জয় শর্মা

সম্পাদকীয়

সবজান্তা, অশিক্ষিতদের নিয়ে সত্যিই বড় মুশকিল। সবজান্তা মহুয়া মৈত্রের দাবী ছিল 'ঠুমকা' নাকি খারাপ শব্দ এবং গিরিরাজ সিং 'ঠুমকা' শব্দ ব্যবহার করে মমতা ব্যানার্জিকে অপমান করেছেন। যথারীতি গেল গেল রব উঠিল। অদ্ভুত! ঠুমকার ইংরাজি অর্থ 'ডান্সিং অ্যারাউন্ড' বা নেচে বেড়ানো। সত্যিই তো মমতা ব্যানার্জি নেচে বেড়াচ্ছিলেন দুর্নীতিতে ডুবে থাকা পশ্চিমবঙ্গের ফিল্ম উৎসবের মঞ্চে, যদিও তিনি 'ফিল্ম' শব্দটা এখনও 'উশ্চারন' করতে পারেন না এবং এটাই প্রথম নয়, এর আগেও মমতা ব্যানার্জি নেচেছিলেন এই কলকাতাতেই। মঞ্চে নয়, গাড়ির বনেটের ওপর। শ্রদ্ধেয় জননেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর গাড়ি থামিয়ে গাড়ির বনেটের ওপরে নেচেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন তিনি কংগ্রেস নেত্রী। তাঁর দলের লোকজনদের দুর্নীতির কারনে রাজ্যের অর্থনীতির যখন 'ভাঁড়ে মা ভবানী' অবস্থা তখন সরকারী ফিল্ম উৎসবে তাঁর নাচ যে তাঁকে এক ভাঁড়ে পরিণত করেছে সেটুকু বোঝার মত সম্যক বোধ ও বুদ্ধি তাঁর আছে কিনা সন্দেহ। 'চোখ বুজে থাকা মুখ্যমন্ত্রী'-র সম্বিত ফেরাতে যদি গিরিরাজ সিং 'ঠুমকা' শব্দ ব্যবহার করে থাকেন তাহলে বেশ করেছেন। একজন ব্যক্তিত্বহীন মানুষ দিনের পর দিন যা খুশী তাই বলে যাবেন, অপমান করবে বাংলার সংস্কৃতিকে কিন্তু তার সমালোচনা করলেই তাঁর পোষা শেয়ালরা হুক্কাহুয়া করবে – আর তাতে আমাদের চুপ করে থাকতে হবে? একদম নয়। যুক্তির আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে হবে রাজনীতির নামে তৃণমূলের ভণ্ডামি।

আসলে একটা রাজনৈতিক দল যার কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই। কিছু হাড়হাভাতে – অশিক্ষিত সারাক্ষণ শুধু খাইখাই করছে। লিপস্টিক থেকে শুরু করে রাজ্যের মানুষের রেশন, বাচ্চাদের মিড-ডে মিলের টাকা থেকে আবাস যোজনার টাকা –যা পাচ্ছে গোগ্রাসে খেয়ে নিচ্ছে। আর দিনের শেষে রাজ্যের 'ভিক্ষা-বাবা' ফিরহাদের জড়ানো গলায় লেকচারবাজি। শুনে বোঝা মুশকিল রাজনৈতিক ন্যারেটিভ নাকি ট্রেনে চিরুনি বিক্রি করছে।

তিন রাজ্যের গেরুয়া ঝড়ের পর প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন, "বিভিন্ন রাজ্যে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এজেন্সির তদন্ত নিয়ে বিরোধীরা বারবার যে যে প্রশ্ন তুলছিল, মানহানি করছিল – এই বিপুল জয় সেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জনসমর্থন"। এবং ঠিক তার ২৪ ঘন্টা আগে কলকাতায় অমিত শাহ এসে খুঁটি নেড়ে দিয়ে চলে গেছে তৃণমূলের। শাহের বক্তব্যের পাল্টা তৃণমূল দিতে পারেনি। দেওয়ার অবস্থাতেও নেই। মমতা হাড়ে হাড়ে জানেন, সারাদিন শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে "চোর চোর চোর চোর " বলে কোথায় নিয়ে গেছে। সেকারনেই তিনি এখন ফিল্ম উৎসব, ভাইপোর বিয়ে, গীতা পাঠের পাল্টা চণ্ডী পাঠ দিয়ে হাওয়া ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। সময় নিচ্ছেন। খুঁজছেন একটা মুখোশ। ভালমানুষের মুখোশ। যেমনটা লালুপ্রসাদও একসময় চেয়েছিলেন। তারপর পচে মরেছিলেন জেলেই।

জয় হিন্দ।

আজকের বিজয় ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন

‘সবকা সাথ্ সবকা বিকাশ’ ধারণা আজ জয়ী হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

তিন রাজ্য গেরুয়া ঝড়ে ভেসে যাওয়ার পর নয়াদিল্লিতে দলের সদর দফতর থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে ভাষণ দিয়েছিলেন, সে ভাষণ হুবহু বাংলায় তুলে ধরা হল এ রাজ্যের নেতা-কর্মীদের জন্য। বাংলায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অনুবাদ করেছেন অভিজিৎ দাস ববি।

ভারত মাতা দীর্ঘজীবী হোক।।
আওয়াজ তেলেঙ্গানায় পৌঁছতে হবে, ভারত মাতা কি...জয়...
ভারত মাতা দীর্ঘজীবী হোক...

আজকের বিজয় ঐতিহাসিক, নজিরবিহীন। আজ সবকা-সাথ বিকাশের চেতনা বিরাজ করছে। আজ উন্নত ভারতের ডাকের জয় হয়েছে। আজ আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্পের জয় হয়েছে। আজ বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দেওয়ার চিন্তার জয় হয়েছে। আজ ভারতের উন্নয়ন এবং রাজ্যগুলির উন্নয়নের জন্য এই চিন্তার জয় হয়েছে। আজ সততা, স্বচ্ছতা ও সুশাসনের জয় হয়েছে। আমি এই প্ল্যাটফর্ম থেকে সকল ভোটারকে শ্রদ্ধার সাথে প্রণাম জানাই। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও ছত্তিশগড়ের মানুষ বিজেপির প্রতি অগাধ স্নেহ দেখিয়েছে। তেলেঙ্গানায়ও বিজেপির সমর্থন ক্রমাগত বাড়ছে। এটা আমাদের সকলের সৌভাগ্য আমি যখন আমার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে এত ভালবাসা এবং বিশ্বাস পাই তখন আমি ব্যক্তিগতবাবে অনুভব করি যে আমার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আজও আমার মনে একই অনুভুতি আছে। আমি আমার মা-বোন-কন্যাদের সামনে, আমি আমার তরুণ বন্ধুদের সামনে, আমি আমার কৃষক ভাই-বোনদের সামনে, আমি আমাদের দরিদ্র পরিবারের সামনে, বিজেপিকে সমর্থনের বিষয়ে, আমি তাদের সিদ্ধান্তের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তাদের কাছে আমাদেরকে সমর্থনের জন্য আবেদন রেখেছিলাম এবং তারা আন্তরিকভাবে সমর্থন দিয়েছেন।

এই নির্বাচনে দেশকে বিভিন্ন বর্ণে বিভক্ত করার অনেক চেষ্টা করা হয়। কিন্তু আমি ক্রমাগত বলছিলাম যে আমার কাছে দেশের সবচেয়ে বড় জাতি মাত্র চারটি জাতি। এবং যখন আমি চারটি বর্ণের কথা বলি... আমাদের নারী শক্তি, আমাদের যুবশক্তি, আমাদের কৃষক পরিবার এবং আমাদের দরিদ্র পরিবার, এই চারটি বর্ণের ক্ষমতায়নের মাধ্যমেই দেশ শক্তিশালী হতে চলেছে। আজ, আমাদের ওবিসি বন্ধুদের একটি বড় সংখ্যা এই বিভাগে পড়ে। আজ, আমাদের উপজাতি বন্ধুদের একটি বিশাল সংখ্যক এই শ্রেণীতে পড়ে। আর এই নির্বাচনে, এই চার জাতি বিজেপির পরিকল্পনা এবং বিজেপির রোডম্যাপ নিয়ে বেশ উৎসাহ দেখিয়েছে। আজ প্রত্যেক গরিব মানুষ বলছে সে নিজের মত করে বেঁচে আছে। আজ প্রতিটি বঞ্চিত মানুষের মনে মনে হচ্ছে তিনি নিজেই এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। আজ প্রত্যেক কৃষক একথা বলছে, এই নির্বাচনে প্রত্যেক কৃষক জয়ী হয়েছে। আজ প্রতিটি আদিবাসী ভাই-বোন খুশি এই ভেবে যে, তিনি যাকে ভোট দিয়েছেন সেই বিজয় তার নিজের। আজ প্রতিবার প্রথমবারের ভোটাররা গর্বের সঙ্গে বলছেন, আমার প্রথম ভোটই আমার জয়ের কারণ হয়েছে। এই জয়ে প্রতিটি নারীই তার জয় দেখছেন। এই বিজয় সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা প্রতিটি যুবক তার বিজয় দেখছে। প্রতিটি নাগরিক যারা 2047 সালে ভারতকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে দেখতে চায় তারা এটিকে সাফল্য হিসাবে বিবেচনা করছে।

বন্ধুরা,

আজ দেশের নারী শক্তিকে বিশেভভাবে অভিনন্দন জানাব। জনসভায় আমি প্রায়ই বলতাম যে এই নির্বাচনে বিজেপির পতাকা তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নারী শক্তি বেরিয়ে এসেছে। আর দেশের নারী শক্তি যখন কারো রক্ষাকবচ হয়ে ওঠে, তখন কোনো শক্তিই তার ক্ষতি করতে পারে না। আজ নারীশক্তি বন্দন আইন দেশের মা, বোন ও কন্যাদের মনে নতুন আস্থা জাগিয়েছে। আজ, দেশের প্রতিটি মহিলা আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছে যে বিজেপি সরকারে তার সক্রিয় অংশগ্রহণ নতুন উচ্চতায় পৌঁছতে চলেছে। আজ প্রতিটি বোন এবং কন্যা স্পষ্টভাবে অনুভব করে যে বিজেপিই মহিলাদের মর্যাদা, মহিলাদের সম্মান এবং মহিলাদের সুরক্ষার সবচেয়ে বড় গ্যারান্টি। তারা দেখেছেন যে বিজেপি গত 10 বছরে তাদের শৌচাগার, বিদ্যুৎ, গ্যাস, কলের জল, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ইত্যাদির মতো মৌলিক সুবিধা দেওয়ার জন্য কতটা সততার সাথে কাজ করেছে। আজ তারা দেখছেন কিভাবে বিজেপি তাদের পরিবার ও সমাজে তাদের অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে এবং তাদের কর্মসংস্থান ও স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য নতুন সুযোগ প্রদানের জন্য ক্রমাগত কাজ করছে। নারী শক্তির বিকাশও বিজেপির উন্নয়ন মডেলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। আর তাই এই নির্বাচনে মহিলা, বোন এবং কন্যারা একভাবে

বিজেপির জয়ের পুরো দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন এবং সম্পূর্ণ আশীর্বাদ দিয়েছেন। আজ, আমি দেশের প্রতিটি বোন ও কন্যাকে বিনয়ের সাথে বলব যে বিজেপি আপনাদের প্রতি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা 100 শতাংশ পূরণ হবে এবং এটি মোদীর গ্যারান্টি। আর মোদীর গ্যারান্টি। আর মোদীর গ্যারান্টি মানে...সম্পূর্ণ হওয়ার গ্যারান্টি।

বন্ধুরা,

নির্বাচনের ফলাফল আরও একটি বিষয় পরিষ্কার করেছে। দেশের তরুণরা চায় শুধু উন্নয়ন। যেখানেই সরকার তরুণদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে, সেই সরকারগুলোকে ভোট দিয়ে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে। রাজস্থান হোক, ছত্তিশগড় হোক বা তেলেঙ্গানা... এই সব সরকারই পেপার ফাঁস ও নিয়োগ কেলেঙ্কারির অভিযোগে ঘেরা ছিল। ফলে এই তিন রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা দলগুলো এখন সরকারের বাইরে। আজ, দেশের যুবকদের মধ্যে আস্থা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে যে শুধুমাত্র বিজেপিই তাদের আকাঙ্খা বোঝে এবং তাদের জন্য কাজ করে। দেশের যুবসমাজ জানে যে বিজেপি সরকার যুববান্ধব এবং তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করতে চলেছে।

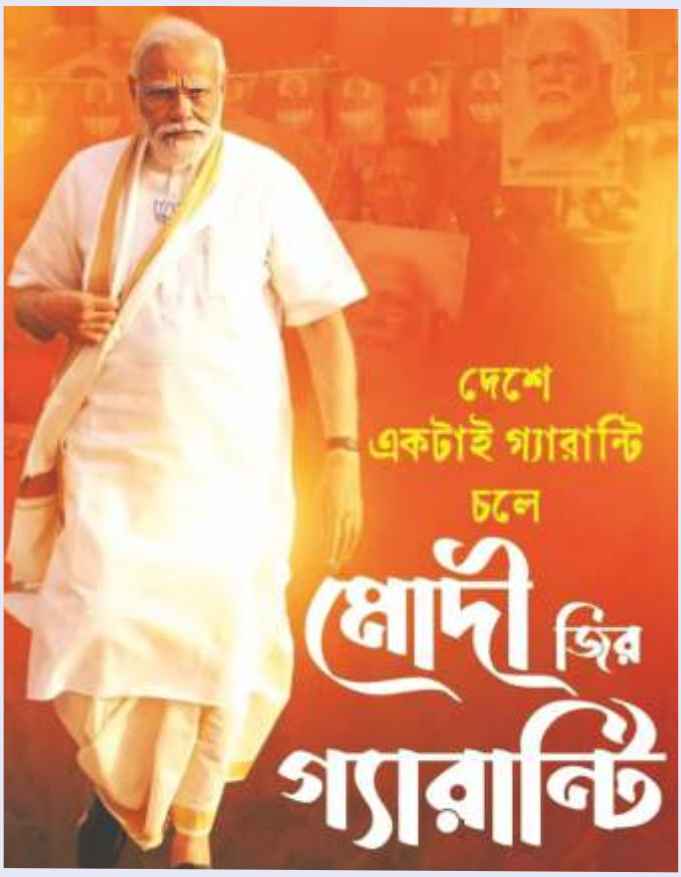

বন্ধুরা,

আজ দেশের আদিবাসী সম্প্রদায়ও প্রকাশ্যে তাদের মত প্রকাশ করছে। এই সেই আদিবাসী সম্প্রদায় যা কংগ্রেসের নীতির কারণে সাত দশক ধরে পিছিয়ে ছিল এবং যাকে সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাদের জনসংখ্যা আজ প্রায় ১০ কোটি। গুজরাটের নির্বাচনী ফলাফলেও আমরা তা দেখেছি। যে কংগ্রেস কখনও আদিবাসী সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসাও করেনি, সেই আদিবাসী সমাজ কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। আজ আমরা এমপি, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানেও একই অনুভূতি দেখেছি। এই রাজ্যগুলির আদিবাসী অঞ্চলের আসনগুলিতে কংগ্রেস সুইপ করেছে। আদিবাসী সমাজ আজ উন্নয়নের জন্য উচ্ছাকাঙ্খী। এবং তিনি আত্মবিশ্বাসী যে শুধুমাত্র বিজেপি সরকারই এই আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে।

আমার বিজেপি পরিবারের সদস্যরা,

আজ আমি প্রতিটি রাজ্যের বিজেপি কর্মীদের প্রশংসা ও শুধুই প্রশংসা করব। বিজেপি ও পদ্ম-র প্রতি আপনার আনুগত্য ও নিষ্ঠা অতুলনীয়। আপনি সম্পূর্ণ সততার সাথে জনগণের কাছে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। এর ফল আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি, নাড্ডাজি, তাঁর নীতি ও কৌশলগুলি যেভাবে বাস্তবায়ন করেছেন তার ফলেই এই বিজয়। নির্বাচনের সময়, তাঁর পরিবারে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল, তা সত্ত্বেও, নাড্ডাজি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী হিসাবে দিনরাত দাঁড়িয়েছিলেন।

বন্ধুরা,

এত বছরের রাজনীতিতে আমি সবসময় ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দূরে থেকেছি। আমি কখনই প্রতিশ্রুতি বা বড় ঘোষণা করি না, এত বছর হয়ে গেছে, আমি কখনই করি না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে আমিও আমার এই নিয়ম ভেঙেছি। রাজস্থানে মাভজি মহারাজকে শ্রদ্ধা জানানোর সময়, আমি তাঁর নিজের মাটিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে কংগ্রেস সরকার রাজস্থানে ফিরবে না। আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই, কিন্তু রাজস্থানের মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল, সেখানকার মানুষের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল এবং আজ আমরা তার ফল দেখতে পাচ্ছি। মধ্যপ্রদেশও আবার আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে বিজেপির সেবার চেতনার বিকল্প নেই। সেখানে দুই দশক ধরে বিজেপির সরকার রয়েছে এবং এত বছর পরেও বিজেপির প্রতি আস্থা ক্রমাগত দৃঢ় হচ্ছে। ছত্তিশগড়ের পরিবারের সদস্যদের উদ্দেশে, আমি যখন সেখানে নির্বাচনী মিটিংয়ে গিয়েছিলাম, আমি নিজেই ছত্তিশগড়ের নির্বাচনের প্রথম বৈঠকে বলেছিলাম, আমি আপনাদের কাছে কিছু চাইতে আসিনি, আমি বলছি ৩ ডিসেম্বরের পর, সরকার গঠনের শপথ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাতে এসেছি। ছত্তিশগড়ের ফলাফল থেকে স্পষ্ট যে, প্রতিটি পরিবারই সেই বিষয়টি মেনে নিয়েছে। আমি তেলেঙ্গানার জনগণ এবং তেলেঙ্গানার বিজেপি কর্মীদের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতি নির্বাচনেই তেলেঙ্গানায় বিজেপির গ্রাফ ক্রমাগত বাড়ছে। আমি তেলেঙ্গানার জনগণকে আশ্বস্ত করছি যে বিজেপি আপনাদের সেবার কোনো কসরত রাখবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি তেলেঙ্গানা সংযোজন কোসাম এল্লাপুরুংপানি চিন্টুনে উত্তুন্দি তেলেঙ্গানাতো মাকোচালামঞ্চি অনুভানধামুন্ডি।

এত বছরের রাজনীতিতে আমি সবসময় ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দূরে থেকেছি। আমি কখনই প্রতিশ্রুতি বা বড় ঘোষণা করি না, এত বছর হয়ে গেছে, আমি কখনই করি না। কিন্তু এবারের নির্বাচনে আমিও আমার এই নিয়ম ভেঙেছি। রাজস্থানে মাভজি মহারাজকে শ্রদ্ধা জানানোর সময়, আমি তাঁর নিজের মাটিতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে কংগ্রেস সরকার রাজস্থানে ফিরবে না। আমি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা নই, কিন্তু রাজস্থানের মানুষের প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল, সেখানকার মানুষের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল এবং আজ আমরা তার ফল দেখতে পাচ্ছি। মধ্যপ্রদেশও আবার আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে বিজেপির সেবার চেতনার বিকল্প নেই।

আমার বিজেপি পরিবারের সদস্যরা

এই নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিধ্বনি শুধু এমপি, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এই ফলাফলের প্রতিধ্বনি বহুদূর যাবে। এই নির্বাচনী ফলাফলের প্রতিধ্বনি সারা বিশ্বে শোনা যাবে। এই নির্বাচনী ফলাফল ভারতের উন্নয়নে বিশ্ববাসীর আস্থা

আরও জোরদার করবে। এই নির্বাচনী ফলাফল বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগকারীদের নতুন আস্থাও দেবে। বিশ্বাস এই যে স্বাধীনতার স্বর্ণযুগে উন্নত ভারতের জন্য আমরা যে সংকল্প নিয়েছি তা ক্রমাগত জনগণের আশীর্বাদ পাচ্ছে। আজ বিশ্ব দেখছে ভারতের গণতন্ত্র এবং ভারতের ভোটাররা কতটা পরিপক্ক। আজ বিশ্ব দেখছে যে ভারতের জনগণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং একটি স্থিতিশীল সরকারের জন্য চিন্তাভাবনা করে ভোট দিচ্ছে।

বন্ধুরা,

সেবা ও সুশাসনের রাজনীতির নতুন মডেল দেশের সামনে তুলে ধরল বিজেপি। আমাদের নীতি ও সিদ্ধান্তের মূলে শুধু দেশ এবং দেশবাসী, ভারত মাতা কি জয় আমাদের মন্ত্র। অতএব, বিজেপি সরকারগুলি কেবল নীতিগুলিই তৈরি করে না, এটি নিশ্চিত করে যে সেগুলি প্রতিটি অধিকারী ব্যক্তি এবং প্রতিটি সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছায়। বিজেপি পারফরম্যান্স এবং ডেলিভারির রাজনীতিকে দেশের সামনে একটি বাস্তবতা হিসাবে নিয়ে এসেছে। ভারতের ভোটার জানেন স্বার্থপরতা কী, জনস্বার্থ কী এবং জাতীয় স্বার্থ কী। দেশ জানে দুধ আর পানির পার্থক্য। এই ভোটার কোনো না কোনোভাবে জয়লাভের জন বড় বড় বিবৃতি দিতে এবং লোভের ঘোষণা দিতে পছন্দ করেন না। ভোটারদের তাদের জীবন উন্নত করার জন্য একটি পরিষ্কার রোডম্যাপ দরকার, তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা দরকার, তাদের বিশ্বাস দরকার। ভারতের ভোটাররা জানেন যে যখন ভারত এগিয়ে যায়, রাষ্ট্রের উন্নতি হয় এবং প্রতিটি পরিবারের জীবন উন্নত হয়। সে কারণেই তারা বিজেপিকে বেছে নিচ্ছেন, ক্রমাগত তাকে বেছে নিচ্ছেন। এবং কেউ কেউ বলছেন যে আজকের হ্যাটট্রিক 24 এর হ্যাটট্রিক নিশ্চিত করেছে।

বন্ধুরা,

আজকের ম্যান্ডেট এটাও প্রমাণ করেছে যে, দুর্নীতি, তুষ্টি ও স্বজনপ্রীতির ব্যাপারে দেশের ভেতরে, দেশের প্রতিটি নাগরিকের হৃদয়ে জিরো টলারেন্স তৈরি হচ্ছে। আজ দেশ মনে করে যে এই তিনটি অশুভ দূর করতে যদি কেউ কার্যকরী হয় তবে তা কেবল বিজেপি। দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার যে অভিযান শুরু করেছে তাতে ব্যাপক জনসমর্থন পাচ্ছে। যারা দুর্নীতিবাজদের পাশে দাঁড়াতে সামান্যতম লজ্জাও বোধ করে না তাদের জন্য ভোটারদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি। দেশের মানুষ আজ সেই সেব লোকেদের কাছে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে। আর এই ধরনের লোকের যারা নানা যুক্তি দিয়ে দুর্নীতিবাজদের ধামাচাপা দেয় এবং ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে... এই ধরনের লোকেরা, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা তদন্তকারী সংস্থাগুলির মানহানি করতে দিনরাত ব্যস্ত থাকে তাদের বোঝা উচিত যে এই নির্বাচনের ফলাফল দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জনসমর্থন রয়েছে। এই নির্বাচনী ফলাফল কংগ্রেস এবং তার অহংকারী জোটের জন্যও একটি বড় শিক্ষা। শিক্ষণীয় বিষয় হল, ছবি যতই ভালো হোক না কেন, পরিবারের কয়েকজন সদস্যের মঞ্চে এসে দেশের আস্থা জয় করা যায় না। দেশের মানুষের মন জয় করতে হলে জাতীয় সেবার আবেগ থাকতে হবে, যা এই অহংকারী জোটে সামান্যতমও দেখা যায় না। গালাগালি, হতাশা, নেতিবাচকতা অবশ্যই এই অহংকারী জোটকে মিডিয়ার শিরোনাম দিতে পারে, কিন্তু জনগণের হৃদয়ে স্থান দিতে পারে না।

বন্ধুরা,

আজকের ফলাফল সেই সব শক্তির জন্যও সতর্কবাণী, যারা প্রগতি ও জনকল্যাণের রাজনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। যখনই উন্নয়ন হয়, কংগ্রেস ও তার সহযোগীরা বিরোধিতা করে। আমরা যখন বন্দে ভারত ট্রেন চালু করি, তখন কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা তা নিয়ে মজা করে। আমরা যখন আয়ুষ্মান ভারত চালু করি, তখন কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা এতে বাধা সৃষ্টি করে। যখন আমরা দরিদ্রের কলের জল সরবরাহ করি, কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা এতে দুর্নীতির পথ তৈরি করতে শুরু করে। আমরা যখন গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য তহবিল পাঠাই, কংগ্রেস এবং তার সহযোগীরা তা দরিদ্রের কাছে পৌঁছানোর জন্য বাধা তৈরি করে। আজ গরীবরা এই ধরনের সমস্ত দলকে সতর্ক করে দিয়েছে-নিজেকে সংস্কার করুন, অন্যথায় জনগণ আপনাকে বেছে বেছে পরিষ্কার করে দেবে। আজ, এই জাতীয় দলগুলির জন্য একটি শিক্ষা রয়েছে যারা কেন্দ্রীয় সরকারের দরিদ্র কল্যাণ প্রকল্প এবং তাদের জন্য পাঠানো তহবিলের মধ্যে আসার চেষ্টা করবেন না, এটি জনসাধারণের আদেশ, অন্যথায় যারা এর মধ্যে আসবে জনসাধারণ তাকে সরিয়ে দেবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে কংগ্রেস ও তার মিত্রদের প্রতি আমার বিনীত পরামর্শ, দয়া করে এমন রাজনীতি করবেন না যা দেশবিরোধী শক্তিকে শক্তি দেয়, যা দেশকে বিভক্ত করতে চায় এমন লোকেদের শক্তি দয়ে, যা দেশকে দুর্বল করে এমন ধারণাগুলিকে প্রেরণা দেয়।

বন্ধুরা,

আজ ভারতের অর্থনীতির প্রতিটি চাকা পূর্ণ গতিতে ঘুরছে। কেউ কেউ বলছিলেন যে বিশ্বমন্দা ভারতকে প্রভাবিত করেছে। *আজ ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনৈতিক শক্তি। আজ ভারতের আত্মবিশ্বাস, ভারতের মানুষের আত্মবিশ্বাস এক অভূতপূর্ব স্তরে রয়েছে।* আজ ভারতে, দেশে রেকর্ড GST সংগ্রহ হচ্ছে। কৃষি উৎপাদনে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হচ্ছে। ভারতের স্টক মার্কেটে আস্থা তুঙ্গে। আজ ভারতের রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। UPI লেনদেনের জন্য নতুন রেকর্ড তৈরি করা হচ্ছে। উৎসবে কেনাকাটার নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। গাড়ি বিক্রিতে নতুন রেকর্ড তৈরি হচ্ছে। আজ ভারতে সিমেন্ট উৎপাদন বেড়েছে, কয়লা উৎপাদন বেড়েছে। আজ ভারতে ইস্পাত উৎপাদন বেড়েছে, বিদ্যুৎ উৎপাদন বেড়েছে। সারা বিশ্বের কোম্পানিগুলি ভারতে উৎপাদন করতে আগ্রহী। আকাশপথে ভ্রমণকারীর সংখ্যা সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে এবং গৃহঋণ খাতেও ব্যাপক প্রবৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে।

প্রত্যেক দরিদ্রকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্পটি আগামী 5 বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। বিজেপি সরকারের অধীনে ৪ কোটি দরিদ্র পরিবারের জন্য স্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে একটি স্থায়ী ছাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি বাড়িতে কলের জল পৌঁছে দেওয়ার প্রচারণা চলছে দ্রুত গতিতে। আজ রেকর্ড গতিতে দেশে নতুন নতুন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে।

বন্ধুরা,

আজ ভারতের ভৌত অবকাঠামো (Physical infrastructure) সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হচ্ছে। দেখবেন, এক্সপ্রেস ওয়ে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডরের নেটওয়ার্ক চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতীয় রেল আজ রূপান্তরে সবচেয়ে বড় পর্যায় অতিক্রম করেছে। আজ দেশে নতুন নতুন রেলস্টেশন তৈরি হচ্ছে, আধুনিক ট্রেন আসছে। সিদ্ধান্তগুলো নতুন।

এবং আমি দেশবাসীকে বলতে চাই, আমি প্রতিটি দেশবাসীকে বলতে চাই, এবং আমি আমার ট্র্যাক রেকর্ডের ভিত্তিতে বলতে চাই, আমি অত্যন্ত সততার সাথে বলতে চাই... আমি অত্যন্ত দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই.... তোমাদের স্বপ্ন... তোমদের স্বপ্ন আমার দেশবাসী, তোমাদের স্বপ্নই আমার সংকল্প। আপনার স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আমার সংকল্প আমার আধ্যাত্মিক অনুশীলন এবং আমার তপস্যা উভয়ই।

বন্ধুরা,

ভারতের ডিজিটাল পরিকাঠামো বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ ভারত 5G নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় দেশগুলির মধ্যে পৌঁছেছে। আজ ভারতের প্রতিটি গ্রামে অপটিক্যাল ফাইবার পৌঁছে যাচ্ছে। আজ, দেশের সামাজিক অবকাঠামোতে অভূতপূর্ব গতিতে কাজ করা হচ্ছে। প্রত্যেক দরিদ্রকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার প্রকল্পটি আগামী 5 বছরের জন্য বাড়ানো হয়েছে। বিজেপি সরকারের অধীনে ৪ কোটি দরিদ্র পরিবারের জন্য স্থায়ী ঘর তৈরি করা হয়েছে। আমরা প্রতিটি দরিদ্র পরিবারকে একটি স্থায়ী ছাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি বাড়িতে কলের জল পৌঁছে দেওয়ার প্রচারণা চলছে দ্রুত গতিতে। আজ রেকর্ড গতিতে দেশে নতুন নতুন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ তৈরি হচ্ছে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ছে।

বন্ধুরা,

আজ ভারত এগিয়ে যাচ্ছে, ভারতের নাগরিকরা এগিয়ে যাচ্ছে। ভারতের মানুষ এই গতি বজায় রাখতে চায়। এ থেকে এখন আর পিছিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। আর মোদির এই পশ্চাদপসরণ কখনোই মেনে নিতে পারেন না। ভারতের মানুষ স্থিতিশীলতা চায়। ভারতের মানুষ উন্নত ভারতের যাত্রাকে ত্বরান্বিত করতে চায়। আমি দেশের প্রতিটি যুবককে উন্নত ভারতের দূত হওয়ার আহ্বান জানাই। তার উচিত উন্নত ভারতের সিদ্ধান্তের নেতৃত্ব দেওয়া। আমি বিজেপি কর্মীদের বলব— প্রত্যেক বিজেপি কর্মী, নমো অ্যাপে যান এবং কমপক্ষে 10 জনকে উন্নত ভারতের রাষ্ট্রদূত করুন। আজ আমাদের এমন একটি প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে যার স্বপ্ন একটি উন্নত ভারত। যার সংকল্প একটি উন্নত ভারত। যার সাধানায় উন্নত ভঅরত, যার নিবেদন উন্নত ভারত।

বন্ধুরা,

উন্নত ভারত গড়তে হলে কোনো নাগরিক পিছিয়ে না থাকা খুবই জরুরি। এই নির্বাচনে, আমি ক্রমাগত বলেছি যে বিজেপি সরকার প্রতিটি সুবিধাভোগীর কাছে পৌঁছাবে এবং তাকে সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেবে। এই জন্য, কেন্দ্রীয় সরকার 14 ই নভেম্বর অর্থাৎ আদিবাসী গর্ব দিবস, অর্থাৎ ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মবার্ষিকী থেকে বিকাশ ভারত সংকল্প যাত্রা শুরু করেছে। বঞ্চিত মানুষকে প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করতে সরকার নিজেই জনগণের দরজায় কড়া নাড়ছে। যে সব এলাকায় এই যাত্রা পৌঁছচ্ছে, সেখানে মানুষ উদযাপন করছে যে মোদীর গ্যারান্টি দেওয়া গাড়ি তাদের গ্রামে আসছে। আজ এই বিজয় অনুষ্ঠান থেকে আমি বিজেপির প্রতিটি কর্মীকে পরামর্শ ও আহ্বান জানাব। এখন থেকে আজ থেকে আপনাকে মোদীর গ্যারান্টিযুক্ত এই গাড়িটিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মোদী যে গাড়ির গ্যারান্টি দিয়েছেন তা দেশের সাফল্যের গ্যারান্টি দেবে, আর এটাই মোদির গ্যারান্টি। এবং আপনাকে আরও একটি জিনিস মনে রাখতে হবে—যেখানে অন্যের আশা শেষ হয়, মোদির গ্যারান্টি সেখান থেকেই শুরু হয়।

আমার পরিবারের সদস্যরা,

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ শুরু করেছে, যা সারা দেশ আজ অনুভব করছে। এই শক্তি উন্নত ভারতের জন্য প্রস্তুত ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। আমাদের এই শক্তি বজায় রাখতে হবে, আমাদের এই শক্তি বাড়াতে হবে। আমাদের ১৪০ কেটি ভারতীয়ের আস্থা বজায় রাখতে হবে। আমাদের সবাইকে আমাদের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের প্রতিটি মন বুঝতে হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। অমরত্বের উন্নয়ন যাত্রায় সবাইকে অংশীদার করতে হবে। যারা আমাদের থেকে অনেক দূরে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাদের সন্দেহ আছে তাদের মধ্যে আমাদের আস্থা তৈরি করতে হবে। বিজেপি কর্মীদের উপর দায়িত্ব আরও বেড়েছে। কারণ নেতিবাচক শক্তিগুলো এখন দ্রুত ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে। দেশকে বিভক্ত করার চেষ্টাকারী শক্তিগুলো এখন তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবে। যারা সমাজে ব্যবধান তৈরি করেছে তারা এখন নতুন সুযোগ খুঁজবে। আমাদের তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে এবং তাদের মিথ্যা বর্ণনার জবাব দিতে হবে। তার চেয়েও বেশি আমাদের জনগণের আস্থা বজায় রাখতে হবে।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ইতিবাচক শক্তির প্রবাহ শুরু করেছে, যা সারা দেশ আজ অনুভব করছে। এই শক্তি উন্নত ভারতের জন্য প্রস্তুত ভিত্তিকে আরও মজবুত করেছে। আমাদের এই শক্তি বজায় রাখতে হবে, আমাদের এই শক্তি বাড়াতে হবে। আমাদের ১৪০ কেটি ভারতীয়ের আস্থা বজায় রাখতে হবে। আমাদের সবাইকে আমাদের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। আমাদের প্রতিটি মন বুঝতে হবে। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। অমরত্বের উন্নয়ন যাত্রায় সবাইকে অংশীদার করতে হবে। যারা আমাদের থেকে অনেক দূরে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে। যাদের সন্দেহ আছে তাদের মধ্যে আমাদের আস্থা তৈরি করতে হবে।

বন্ধুরা,

এই উত্তেজনা ও উদ্দীপনার পরিবেশের মধ্যে আমার অভ্যাস যায় না, আমি আবার অনুরোধ করতে থাকি, কারণ আমি মূলত সংগঠন থেকে এসেছি। তাই আমার স্বভাব যায় না। আজ সারাদিন টিভিতে যা চলছে তা দেখার জন্য আমি বেশি সময় দিতে পারিনি, কারণ আমার মনে হয় আমাদের ভারতের পূর্ব সমুদ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড়ের সম্ভাবনা রয়েছে, আর সেই কারণেই বিজয় মহোৎসবেও আমি একই কাজ করি, তাই আমি বলব ঘূর্ণিঝর মিচং সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন উপকূলীয় এলকায় এর প্রভাব পড়তে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারগুলির সাথে ক্রমাগত যোগাযোগ করছে এবং তাদের সম্ভাব্য সমস্ত সহায়তা দিচ্ছে। আমি তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, ওড়িশা এবং বিশেষ করে অন্ধ্র প্রদেশের বিজেপি কর্মীদের বলতে চাই যে রাজ্য সরকার যে দলেরই হোক না কেন, আপনার সর্বশক্তি দিয়ে ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত হওয়া উচিত। প্রশাসনকে পূর্ণ সমর্থন দেওয়া একজন নিবেদিত বিজেপি কর্মীর মূল্যবোধ। আমাদের কাছে দলের চেয়ে দেশ বড়, হৃদয়ের চেয়ে দেশবাসী বড়।

বন্ধুরা,

শুধুমাত্র সকলের প্রচেষ্টায় আমরা আমাদের সিদ্ধান্তগুলি অর্জন করতে পারি। দেশের অমৃত প্রজন্মের প্রতি আমার পূর্ণ আস্থা আছে। আমাদের লক্ষ্য এক, আমাদের অনুশীলন এক, আমাদের স্বপ্ন এক। ভারতের উন্নয়ন অব্যাহত থাকবে। এই আত্মবিশ্বাসের সাথে আমি আবারও সকল ভোটারদের অভিনন্দন জানাই। যে জিতেছে তার জন্য আমি শুভকামনা জানাই। আসুন আমরা সবাই মিলে দেশের সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে সক্ষম হই। আমি আপনাদের সকল কর্মীদের এবং যারা আপনাদের মাধ্যমে মাঠে কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন তাদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

আমার সাথে বলুন ভারত মাতা... ভারত মাতা... ভারত মাতা... আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ,

লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনালে

বিপুল জয় বিজেপির শাহী সমাবেশে কলকাতায় জনপ্লাবন

অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক্সিট পোল রিপোর্টকে রীতিমত উড়িয়ে দিয়ে তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়। ইডি-সিবিআই থেকে বাঁচতে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীরা ইন্ডি মঞ্চে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে নরেন্দ্র মোদীকে তুমুল গালাগালি করেও লাভ হলনা কোনও। বরং দুই রাজ্যে উলটে গেল কংগ্রেস। এমনকি ঠাণ্ডাঘরে বসে পিকে-র বায়বীয় লেকচারও কোনও কাজে দিলনা। কেননা মাটি কামড়ে পড়ে থাকা বিজেপির সংগঠনকে বোঝা ওদের কারও পক্ষে সম্ভব ছিলনা। পাশাপাশি প্রায় একই রকম প্রতিফলন পশ্চিমবঙ্গে। রাজনৈতিক মহলের জল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে ধর্মতলায় শাহী সমাবেশে জনপ্লাবন প্রমাণ করে যে এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান এবং বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যের শাসক দলের প্রবল সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বিজেপি আবার তার ঘর গুছিয়ে নিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনালে বিপুল জয় পেল বিজেপি। কোন রাজ্যেই বিজেপি কোন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তুলে ধরে নি। তা-ই এই জয়কে নিঃসন্দেহে নরেন্দ্র মোদীর জয় বলাই যায়। বিভিন্ন এক্সিট পোল রিপোর্ট বিজেপির খুব একটা ফল হবে বলে ধরে নি। বিশেষ করে মধ্যপ্রদেশে ২০০৩ সাল থেকেই বিজেপির শাসন থাকায় এন্টি-ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর ছিল। কিন্তু দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে একাই জয়লাভ করল। বিজেপির ১৬৩ আসনের সামনে কংগ্রেসকে মাত্র ৬৬ আসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হল। বিজেপি এখানে পেয়েছে প্রায় ৪৯% ভোট। আগের কোন বিধানসভা নির্বাচনেই বিজেপি এত বেশি ভোট কখনও মধ্যপ্রদেশে পায় নি। রাজস্থানেও কংগ্রেসের ৬৯-এর সামনে ১১৫ টি আসন দখল করে সরকার গড়ার নিশ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল বিজেপি। প্রায় সব এক্সিট পোলই দেখিয়েছিল যে, ছত্তিসগড়ে আবার

ধর্মতলায় অমিত শাহের জনসভায় মানুষের ঢল।

কংগ্রেসের সরকারই আসতে চলেছে। কিন্তু এখানেও ৯০ টার মধ্যে ৫৪ টি বিধানসভা দখল করে সরকার গড়ার পথে বিজেপি। কংগ্রেসের একমাত্র সান্ত্বনা তেলেঙ্গানা। সেখানেও বিজেপি বিগত বিধানসভার থেকে অনেক ভাল ফল করেছে। ২০১৮-র ভোট শতাংশ (৭%) দ্বিগুণ করেছে (১৪%)। আর গতবারের ১ টি বিধানসভার জায়গায় এবারে ৮ টি বিধানসভা আসন দখল করেছে। বিজেপির এই বিপুল জয় সহ্য করতে না পেরে একদল আবার নতুন এক বক্তব্য শুরু করেছে যে- বিজেপি মুক্ত দক্ষিণ ভারত। মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, ২০২৩-এর মে মাসের কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের আগে পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের কোন রাজ্যে কংগ্রেসের শাসনও ছিল না। তখন কিন্তু এরা বলেনি যে, কংগ্রেস-মুক্ত দক্ষিণ ভারত। কেরল, তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যগুলিতে আলাদা আলাদা আঞ্চলিক দলের সরকার আছে। বিজেপি পূর্বের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে তাদের ক্ষমতা অনেক বাড়িয়েছে। কর্ণাটকে দু'দফায় সরকারও চালিয়েছে। আর বিগত দুটি লোকসভার ট্রেণ্ড অনুযায়ী, বিধানসভার থেকে অনেক ভাল ফল বিজেপি লোকসভা নির্বাচনে করে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলো থেকে। এতে বাকি ভারতের ন্যায় দক্ষিণ ভারতের নরেন্দ্র মোদীর বিজেপি সরকারের ওপর আস্থাকেই ব্যক্ত করে।

এদিকে, খুব কম দিনের প্রস্তুতিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে জনসভার ডাক দিয়েছিল ২৯-এ নভেম্বর। রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন ছিল এত কম দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কি পারবে এই জনসভা সফল করতে? কিন্তু রাজনৈতিক মহলের জল্পনাকে ভুল প্রমাণ করে দিল ধর্মতলায় ঐ দিনের বিপুল জনসমাবেশ। এ থেকে দুটো জিনিস প্রমাণিত হয়। এক, এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। দুই, বিধানসভা ভোটের পর রাজ্যের শাসক দলের প্রবল সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে বিজেপি আবার তার ঘর গুছিয়ে নিয়েছে। আর রাজ্যজুড়ে বিজেপির এই সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধির কৃতিত্ব অনেকটাই দলের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) মাননীয় অমিতাভ চক্রবর্তীর প্রাপ্য। এছাড়া দলের রাজ্য সভাপতি অধ্যাপক সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে বর্তমান রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা তো আছেই। সপ্তাহের মাঝে কাজের দিনে মধ্য কলকাতায় এই জনপ্লাবন এ রাজ্যে বিজেপি যে ঠিক পথেই চলছে সেটাই আবার প্রমাণ করল।

ধর্মতলায় লক্ষাধিক মানুষের এই জনসভার প্রধান বক্তা ছিলেন অমিত শাহ। রাজ্যের শাসকদলের দুর্নীতি, বাংলাদেশ থেকে ঢালাও অবৈধ অনুপ্রবেশসহ বিভিন্ন বিষয় তাঁর বক্তব্যে ফিরে ফিরে আসে। রাজ্যের ছোট-বড়- মাঝারি নেতাদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার করা নিয়ে তিনি কড়া আক্রমণ করেন। গরু চুরি, কয়লা চুরি, টাকার বিনিময়ে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ ইত্যাদি বিষয় তাঁর বক্তব্যে আসে। যে বাংলা একসময় গোটা ভারতকে পথ দেখাত মমতার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে আজ সেই রাজ্য ভারতের পিছনের সারিতে চলে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সন্ত্রাসের কথা তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে। অমিত শাহ বলেন, দেশের মধ্যে সর্বাধিক রাজনৈতিক হিংসা হয় বাংলায়। আগে যেখানে প্রতিদিন সকালে বাংলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনা যেত, এখন সেখানে প্রতিদিন বোমার আওয়াজ ভেসে আসে। বিজেপির প্রতিটি কর্মী আমাদের ভাইয়ের মতো। আর বাংলার প্রতিটি ভাইয়ের মৃত্যুর বদলা আমরা নেব।

অমিত শাহের বক্তব্যে গোপাল মুখোপাধ্যায়ের কথাও উঠে আসে। মুসলিম লীগ যখন সুহরাওয়ার্দির নেতৃত্বে ১৯৪৬-এ গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং ঘটিয়ে কলকাতাসহ গোটা বাংলাকেই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল- তখন এই গোপাল মুখোপাধ্যায় (যিনি গোপাল পাঁঠা নামেও পরিচিত তাঁর পাঁঠার দোকান ছিল বলে)-এর নেতৃত্বে বাঙ্গালী হিন্দু রুখে দাঁড়ায়। তাঁর জন্যই কলকাতাসহ গোটা বাংলা ভারতে আছে।

সামনের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গসহ গোটা ভারতে বিপুল আসন পেয়ে বিজেপির ক্ষমতায় ফিরে আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। তার পরেই ২০২৬ সালে আসবে এ রাজ্যে এই দুর্নীতির সরকারের অবসানের পালা।

বিনামূল্যে মোদীর রেশন চুরির দায়ে রাজ্যের মন্ত্রী জেলে

শুভ্র চট্টোপাধ্যায়

গরীব কল্যাণে দেশজুড়ে মোদী সরকার যখন সমানে দিচ্ছে, এরাজ্যে তখন গরীবের রেশনেও থাবা বসিয়েছে আলু-বালু-কালু-বাকিবুরের দল। দীপাবলীর ঠিক আগে দেশের ৮০ কোটি মানুষের স্বার্থে নরেন্দ্র মোদী যখন আরও ৫ বছরের জন্য ফ্রি রেশনের ঘোষণা করছেন ঠিক তখন রেশন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মমতা ঘনিষ্ঠ বালু, তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক এরাজ্যে তখন জেলে। খুব স্বাভাবিকভাবে 'সততার প্রতীক' মমতা সমর্থন নিয়ে জেলে যাওয়া জ্যোতিপ্রিয়র পাশে দাঁড়িয়েছেন সমর্থন নিয়ে। উপায় নেই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকা যাচ্ছেনা। কথায় বলে না, "চুরি বিদ্যা মহাবিদ্যা, যদি না পড় ধরা।"

দীপাবলীর ঠিক আগেই, ৪ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের রতলাম এবং ছত্তিশগড়ের দুর্গ-এ নির্বাচনী জনসভা থেকে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি জানান, আগামী পাঁচ বছরের জন্যে বিনামূল্যে রেশনের মাধ্যমে খাদ্যশস্য দেওয়া হবে দেশের ৮০ কোটি নাগরিককে। প্রধানমন্ত্রীর নিজের ভাষায়, "আগামী পাঁচ বছর ৮০ কোটিরও বেশি ভারতবাসীকে বিনামূল্যে রেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি সরকার। আপনাদের ভালবাসা এবং আশীর্বাদই আমাকে শক্তি দেয় এই পবিত্র সিদ্ধান্ত নিতে।" কিন্তু একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের চিত্রটা একেবারেই উলটো। চলতি বছরের দুর্গাপুজোর পরেই রেশনের খাদ্যশস্য চুরির অভিযোগে জেলে গিয়েছেন মমতা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। একদিকে গরিবের অন্ন সংস্থানের কোনও ত্রুটি যেখানে রাখছে না কেন্দ্র সেখানে গরিবের খাদ্য নিরাপত্তাটুকুও চুরি করে নিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ যোজনার অধীনে এই রেশন দেওয়া হবে না। বরং জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় দেওয়া হবে এই রেশন। জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের আওতায় আপাতত প্রতি মাসে মাথাপিছু পাঁচ কিলোগ্রাম খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়। অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার আওতায় থাকা পরিবারগুলিকে মাসে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য প্রদান করা হয়। তবে আগামী পাঁচবছরের জন্যে দেশের৮০ কোটি মানুষ বিনামূল্যে পাবেন রেশন।

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা

প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PM-GKAY) হল এমন একটি প্রকল্প যেখানে প্রতিমাসে দরিদ্রদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। এই প্রকল্পে মাথা পিছু পাঁচ কেজি খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে করোনার সময়ে চালু করা হয় এই প্রকল্প। লকডাউনের সময় গৃহবন্দি গরিব মানুষগুলোর রোজগার বলে কিছু ছিলনা। সেই সময় ভারতের কোনও

ব্যক্তিকে যেন ক্ষুধার্ত হয়ে দিন না কাটাতে হয়, তাই এমন জনমুখী, গরিবদরদী কর্মসূচি গ্রহণ করে মোদী সরকার। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশ দেখেছে মোদী সরকারের মানবিক মুখ। 'চন্দ্রযান' চাইনা ভাত দে বলা ভারতের অতিবামপন্থীরাও নিশ্চয় আড়ালে আবডালে মোদী সরকারের এমন সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবেন। মোদী সরকারকে আম্বানি-আদানির সরকার বলে যাঁরা প্রতি মুহূর্তে কুৎসা রটান, মিথ্যাচার করেন তাঁরাও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে এই সরকার কতটা গরিবদরদী।

মানুষের মৌলিক চাহিদা চুরি করেছে তৃণমূল, পূরণ করেছে বিজেপি

যে কোনও মানুষের মৌলিক চাহিদা হল অন্ন, বস্ত্র এবং বাসস্থান। অর্থাৎ মৌলিক চাহিদার প্রথমে আসে অন্ন। প্রতিটি ভারতবাসীর এই মৌলিক চাহিদার প্রথম চাহিদাকে পূরণ করতে পেরেছে মোদী সরকার। বিরোধীদের কুৎসাকে জবাব দিতে পেরেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের মাধ্যমে বেশিরভাগ গরিব মানুষকে ছাদের নিচে আনতে পেরেছে। কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? কেন্দ্র সরকার যখন গরিবদের জন্য অন্নের সংস্থান করছে, গরিবদের জন্য মাথার উপর পাকা ছাদের বন্দোবস্ত করছে, ঠিক সেই সময়েই অন্নের চাহিদাকে পূরণ না করে তা চুরি করছে রাজ্য সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। কাটমানির মাধ্যমে গরিবদের কাছ থেকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার নাম করে টাকা নিচ্ছে শাসক দলের নেতারা। রেশনের চালও খোলা বাজারে বিক্রি করেছে শাসক দলের ঘনিষ্ঠ ডিস্ট্রিবিউটররা। ভুয়ো হিসাব দেখানো হত কেন্দ্রীয় সরকারকে।

অভিনব পদ্ধতিতে চুরি হত রেশনের খাদ্যশস্য

সাধারণভাবে নিয়ম হল, রেশন ডিলাররা ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য আনেন এবং তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বন্টন করেন। চালকল থেকে খাদ্যশস্য আনার নিয়ম ডিস্ট্রিবিউটরদের। রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে তদন্তে নেমে গোয়েন্দারা সহজেই বুঝে যান যে দুর্নীতির উৎসকেন্দ্র হল ডিস্ট্রিবিউটররা। তবে ডিস্ট্রিবিউটরদের নামে কোনও রকমের অভিযোগ না হওয়ায় আশ্চর্য হয়ে গিয়েছে ইডিও। তার কারণ ডিস্ট্রিবিউটররা যদি কোনও রেশন ডিলারকে খাদ্যশস্য খোলা বাজারে বিক্রি করতে বলেন সে ক্ষেত্রে ডিলারের উচিত সেটা নিয়ে অভিযোগ জানানো। তবে তেমন অভিযোগ কোথাও জানানো হয়নি কেন? আবার নিয়ম অনুযায়ী ডিস্ট্রিবিউটর ডিলার ছাড়া অন্য কোথাও খাদ্যশস্য বিক্রি করতে পারবেন না।

বাকিবুরের সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখতেন সে তালিকাও ইডির হাতে। প্রশ্ন হচ্ছে রেশন ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য খোলাবাজারে গেল কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই ইডি অফিসাররা জানতে পারেন বেশ কয়েকজন রেশন ডিস্ট্রিবিউটর তাঁদের নামে এবং বেনামে রেশনের ডিলারশিপ নিয়ে বসে আছেন এবং সেই ডিলারশিপের মাধ্যমেই খাদ্যশস্য খোলাবাজারে বিক্রি করছেন। ইডি তদন্তকারীদের দাবি, গণবন্টন আইন অনুসারে কোনও ডিস্ট্রিবিউটর নিজের নামে বা নিকট আত্মীয়ের নামে ডিলারশিপ রাখতে পারবেন না। অর্থাৎ তথ্য গোপন করে দুর্নীতি করার জন্যই ডিস্ট্রিবিউটররা নিজের নামে ডিলারশিপ নিয়েছেন। এই সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটরদের সংখ্যা ইতিমধ্যে হাতেও পেয়েছে ইডি। ডিস্ট্রিবিউটরদের মধ্যে কারা কারা বাকিবুরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতেন সেটাও খতিয়ে দেখছেন ইডির আধিকারিকরা।

বিনামূল্যে রেশন, লাভবান হবেন কৃষকরাও

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, মোদী সরকারের এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের মানুষের কাছে শুধুমাত্র খাদ্য নিরাপত্তাই মিটবে এমনটা নয় এর পাশাপাশি লাভবান হবেন দেশের কৃষকরাও। মনে করা হচ্ছে, এই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই বাড়তে পারে গমের চাহিদা। এর আগে যখন এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় তখন অতিরিক্ত ব্যয় হয় ৪৪ হাজার ৭৬২ কোটি টাকা। গত বছর ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৩.৪৬ লাখ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রকল্পটির মেয়াদ বাড়ালে আরও বেশি গমের দরকার হবে। এর ফলে লাভ হবে দেশের কৃষক, বিশেষ করে যাঁরা গম উৎপাদন করেন তাঁদের। অর্থাৎ দেশের কৃষকদের কল্যাণকারী যোজনাও বটে মোদী সরকারের এমন সিদ্ধান্ত।

কংগ্রেসকে নিশানা প্রধানমন্ত্রীর

দেশের কাউকেই যাতে খাবারের অভাবে দিন কাটাতে না হয় সেই কারণেই এই প্রকল্প বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেদিন ছত্তিশগড় থেকে তাঁর এই গরীবদরদী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন সেদিনই দারিদ্র্য দূরীকরণের ইস্যুতে কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানান। প্রসঙ্গত, ১৯৭১ সালের নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসেছিলেন গরিবি হঠাও স্লোগান দিয়ে। এরপর মাঝখানের কয়েক বছর এবং গত ৯ বছর বাদ দিলে বেশিরভাগ সময়ই দেশ শাসন করেছে গান্ধী নেহেরু পরিবার। কখনও সখনও রিমোট কন্ট্রোলের প্রধানমন্ত্রী রেখেছেন তাঁরা। ইন্দিরা গান্ধীর স্লোগানের ৫০ বছর পরেও গরিবের অন্ন সংস্থানের নিরাপত্তার দায়িত্ব মোদী সরকারকেই নিতে হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাই স্পষ্টভাষায় বলেছেন, "গরিবের আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাসকে ঘৃণা করে কংগ্রেস। তারা চায় গরিবরা যেন তাদের সামনে হাত পেতে দান প্রার্থনা করে। ওরা গরিবকে গরিব রাখতে চায়।"

মাথা ব্যথার নাম মহুয়া

স্বাতী সেনাপতি

অবশেষে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত কংগ্রেসের চোখের মণি, অপরিণামদর্শী তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। কি ভাবেন তিনি নিজেকে? মেরিলিন মনরো? সুচিত্রা সেন? কেন তিনি সবসময় নিজেকে রহস্যের আঁধারে ঢেকে রাখতে চান? অদ্ভুত এক বৈপরীত্য নিয়ে চলা জীবন। সংসদে আগুন ঝরাচ্ছেন গরীব কল্যাণ নিয়ে কিন্তু সঙ্গে নিয়ে বসে আছেন বহুমূল্য লুই ভিটন ব্যাগ নিয়ে। সকালে কথা বলছেন আদর্শবাদ নিয়ে, বিকালে সংসদের বাইরে এক কংগ্রেস সাংসদের সঙ্গে কাঁচা আম-পাকা আম নিয়ে ফোটো সেশন। এসব গ্ল্যামার ওয়ার্ল্ডে চলে। রাজনীতির গ্ল্যামার অন্য জায়গায়। সাংসদ গীতা মুখার্জি, সুষমা স্বরাজ বা অধুনা স্মৃতি ইরানিকেও দেখেছে মানুষ। গ্ল্যামারাস হয়ে ওঠার জন্য কি ওনাদের কোন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে উপহার নিতে হয়েছে? অথবা লোকসভা ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেসের লগ ইন আইডি, ওনারা কি কেউ দিয়েছিলেন বিদেশের কোন ব্যবসায়ীকে? মহুয়া মৈত্র মানসিক ভাবে সুস্থ? নাকি ঠাণ্ডা মাথায় সবকিছু করেছেন?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত লিখেছিলেন" হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন"। পশ্চিমবঙ্গে কত রত্ন আছে তা আমাদের জানা নেই তবে তৃণমূল দলটার রত্নের কোনও অভাব নেই। তৃণমূলের বিবিধ রত্নের মধ্যে নবতম সংযোজন মহুয়া মৈত্র। তৃণমূলের নেতাদের স্বভাবই হল চুরি করা - তা সে বালি, কয়লা, সোনা, রেশন হোক বা চাকরি। তবে মহুয়া মৈত্র আরও এক ধাপ উপরে!

তিনি দেশের সুরক্ষাই তুলে দিচ্ছিলেন বিদেশি সংস্থার হাতে। টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন করা বা 'ক্যাশ ফর ক্যোয়ারি', সাংসদদের জন্য নির্দিষ্ট পোর্টালের লগইন পাসওয়ার্ড বিদেশি সংস্থার হাতে তুলে দিয়ে দেশের সুরক্ষাকেই প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন তিনি। ঠিক কি করেছেন সাংসদ মহুয়া মৈত্র?

১. টাকার বিনিময়ে লোকসভায় প্রশ্ন তুলেছেন মহুয়া। যা লোকসভার

স্বাধিকার ভঙ্গের শামিল। এই সংক্রান্ত সকল প্রমাণ দিয়েছেন আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদরি।

২. ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানির থেকে অর্থ উপহার নিয়ে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মহুয়া কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে মহুয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নাম জড়িয়েছেন।

৩. টাকার বিনিময়ে ব্যবসায়ী দর্শন হিরনানদানিকে নিজের লোকসভা ওয়েবসাইটের অ্যাকাউন্ট অ্যাকসেসের লগ ইন আইডি দিয়েছিলেন মহুয়া মৈত্র। মহুয়া স্বীকার করেছেন যে তিনি হীরানন্দানিকে তাঁর লোকসভা পোর্টালের লগইন ও পাসওয়ার্ড দিয়েছিলেন। যার মাধ্যমে লোকসভার প্রশ্ন পোস্ট করা হয়েছিল। মহুয়া দেশে এবং বিদেশ থেকে লগইন করলেও ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি মন্ত্রকের (MEITY) লগ থেকে জানা যায় যে একই দিনে লোকসভা পোর্টালে তাঁর লগইন ছিল দুবাই এবং নিউ জার্সি থেকে। যদিও মহুয়া তখন দেশেই ছিলেন!

বাঁচাবেন তিনি বাঁচাবেন...

মহুয়ার এ হেন কীর্তিকলাপে দেশের প্রভূত ক্ষতি হতে পারে। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে এই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট ইতিমধ্যেই এথিক্স কমিটি জমা দিয়েছে। আসুন দেখে নিই মহুয়া মৈত্রের এই কার্যকলাপ থেকে দেশের কি ক্ষতি হতে পারেঃ-

হুমকির মুখে জাতীয় নিরাপত্তা

হিরানন্দানি বিদেশে থাকেন। তাই তাঁর সঙ্গে লগইন আইডি, পাসওয়ার্ড শেয়ার করার অর্থ দেশের গোপন তথ্য বিদেশি সংস্থার হাতে চলে যাওয়া। এর ফলে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অনুমোদন নেই এমন ব্যক্তিকে লগইন আইডি দেওয়া বেআইনিও বটে। বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সাংসদদের অ্যাকাউন্টে ভাগ করে নেয় সরকার। সেই তথ্য বাইরের লোকের হাতে যাওয়া মানে দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া।

সংবেদনশীল নথি ফাঁস হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা

আগেই আলোচনা করেছি বহু গুরুত্বপূর্ণ, সংবেদনশীল নথি আগেভাগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয় সাংসদদের অ্যাকাউন্টে। তার মধ্যে বহু তথ্য পাবলিক ডোমেনে আসে না। তা কেবল সাংসদদের জন্যই ব্যবহৃত হয়। বিদেশি সংস্থার হাতে লগইন তথ্য তুলে দেওয়া মানে গোপনীয়তার সঙ্গে আপস করা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়,জম্মু ও কাশ্মীর সীমানা বিলের কথা।

এই বিলের খসড়াটি লোকসভায় পেশ করার আগেই সাংসদদের ই-মেইল করে পাঠানো হয়েছিল। এই ধরনের খসড়া বিলগুলি যেগুলি প্রকাশ্যে আনা হয় না, তিন তালাক নিষিদ্ধ করা, দেউলিয়া বিধির মতো অন্তত ২০টি গুরুত্বপূর্ণ বিল আগে থেকেই সংসদীয় পোর্টালে আপলোড করা হয়েছিল। এই জাতীয় নথি ফাঁস হয়ে যাওয়া মানে, জাতীয় নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে।

সন্ত্রাসবাদী হামলার সম্ভবনা

অনুমোদন নেই এমন ব্যক্তিকে সংসদ পোর্টালের লগইন পোর্টালের পাসওয়ার্ড দিলে হ্যাকাররা সেটি ব্যবহার করে পোর্টালে এমন কিছু নথি আপলোড করে দিতে পারে যাতে দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হতে পারে। এমনকি তা সন্ত্রাসবাদী হামলার মুখেও ঠেলে দিতে পারে দেশকে।

লোকসভায় মহুয়া মৈত্র ও তাঁর বহুমূল্য লুই ভিটন ব্যাগ।

নানা গুণে গুণবতী মহুয়া

এত কিছুর পরেও মহুয়া মৈত্র লজ্জিত তো নন বরং তাঁর আচরণ, দাম্ভিকতা নিয়ে অনেকেই অবাক হচ্ছেন, বিস্ময় প্রকাশ করছেন। কিন্তু এটাই প্রথমবার নয় যখন মহুয়া মৈত্র এই ধরনের আচরণ করছেন। সাংবাদিকদের 'দু পয়সার সাংবাদিক' বলা থেকে সংসদে দাঁড়িয়ে গালি দেওয়া, কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি করা সবই দেখেছে দেশের জনতা। তাই এই ধরনের নীতিবোধহীন মানুষজন যে কটা টাকার জন্য দেশের নিরাপত্তা আপস করে নেবেন এতে আর বাহুল্য কি আছে?

যাইহোক, শেষমেষ সাংসদ হিসেবে যথার্থ আচরণবিধি পালন না করার অভিযোগে লোকসভা থেকে বহিষ্কৃত তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। এথিস্ক কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী সংসদে মহুয়াকে বহিষ্কার করা নিয়ে ভোটাভুটি হয়। তাতে বিরধীরা হেরে গেলে সংসদ থেকে মহুয়ার বহিষ্কৃত বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। আশ্চর্যের বিষয় মহুয়াকে ডিফেন্ড করতে তৃণমূলের চেয়েও অনেক বেশি পরিমাণে জান লড়িয়ে দিলো কংগ্রেস। তারপর আসরে নামে তৃমমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ মুখ্যার্জি। যদিও তাদের বক্তব্যে কোন ঝাঁঝ ছিলোনা, শুধু কেবলমাত্র নাটক ছিল। কিন্তু যেভাবে সর্বস্ব নিয়ে অধীর চৌধুরি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেটা সত্যি বহু প্রশ্ন তুলে দেয়।

তাহলে কি মমতা ব্যানার্জি, মুখে মহুয়ার পাশে আছি বললেও, আসলে কংগ্রেস থেকে আসা মহুয়া মৈত্রকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছিল? কংগ্রেস কি আসলে মহুয়া মৈত্রকে দলে ফিরিয়ে নিতে চাইছে। সেকথা সময় বলবে, কিন্তু একটা বিষয় পরিষ্কার, রাজনীতিক হিসেবে মহুয়া সুষমা স্বরাজ বা গীতা মুখ্যার্জি কারও ধারে কাছে নেই।

ভারতের আমজনতার দামী সাংসদ।

অধরা বিশ্বকাপ দিয়ে গেল অনেক কিছু

অভিরূপ ঘোষ

বিশ্বকাপ অধরা হলেও ভারতীয় ক্রিকেট যে নিঃশব্দে ভারতের জাতীয়তাবাদকে আরও একবার শিখরচুড়ায় নিয়ে গেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর এটাই তো স্বাভাবিক ছিল। জাতীয়তাবাদের ঢেউ যে দেশকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ বিরোধীদের ভয়। এতটাই ভয় যে আগ বাড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কটাক্ষ করেন ভারতীয় দলের জার্সির রঙ নিয়ে। যথারীতি জাতীয়তাবাদের সুনামিতে উড়ে গেছে মমতার শিশুসুলভ কটাক্ষ। রাহুল-মমতা দুজনেই আসলে জাতীয়তাবাদকে ঠেকাতে, ভারতীয় ক্রিকেট দলকে উপলক্ষ করে গালাগালি দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদীকে। আর কোন উপায় নেই ওদের। ব্যার্থতার দিনে হাসিমুখে ভারতীয় দলের পাশে থেকে নরেন্দ্র মোদী আরও বড় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন জাতীয়তাবাদ বিরোধী স্বার্থপর জোটকে। এখন 'পাপিষ্ঠ' বা 'অপয়া' বলে নরেন্দ্র মোদীকে যে যাই বলুক না কেন সেটা একেবারেই নিখাদ আবেগের প্রকাশ, তার মধ্যে রাজনীতির লেশমাত্রও নেই।

আবারও স্বপ্নভঙ্গ। শেষ দশ বছর ধরে আইসিসি ট্রফির খরা অব্যাহত দেশে। সব কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলছি আমরা। এবারের বিশ্বকাপও তার ব্যতিক্রম নয়। গোটা টুর্নামেন্টে ভালো খেলেও ফাইনালে গিয়ে হেরে গেলাম আমরা।

কিন্তু শুধুই কি হারলাম আমরা! শুধুই কি সব হারাদের দেশ হয়ে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এলাম মাঠ থেকে! প্রাপ্তির খাতা কি শুধুই শূন্য! না, সেটা একদমই নয়। প্রথমেই আমাদের বুঝে নিতে হবে আসলে আমরা হারিনি। আমরা একটা ম্যাচ কম জিতেছি। এই ফাইনালের আগে আমরাই পরপর দশটা ম্যাচ একতরফাভাবে জিতে এক নতুন কৃতিত্ব সৃষ্টি করেছিলাম। এবারের বিশ্বকাপের সব থেকে বেশি রান করা ব্যাটার বা সব থেকে বেশি উইকেট নেওয়া বোলার - সবাই আমাদের। কিন্তু এর অর্থ কোনোদিনই এটা নয় যে দেশের চেয়ে বড় হয়ে গেছে ব্যক্তি। এর অর্থ এটাও নয় যে পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। আমাদের ভাবতে হবে কেন বারবার এমনটা হচ্ছে।

২০১৪ সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছি আমরা, জিততে পারেনি। ২০১৫ আর ২০১৯ সালের দুটো ওয়ান ডে বিশ্বকাপে একটানা ভালো খেলেও সেমিফাইনালে হেরে গেছি আমরা। অন্যদিকে টেস্ট ক্রিকেটে আজ অবধি দুটো ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ হয়েছে যার দুটোতেই ফাইনালে উঠেছি আমরা। দুর্ভাগ্যক্রমে দু'ক্ষেত্রেই আমরা রানার আপ। তারপর এই এবারের বিশ্বকাপ। লিগ স্টেজে টানা ভালো খেলেও নক আউটে উঠে বারবার রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি আমরা। একবার নয়, বারবার।

খেলায় হার জিত থাকে। দু'পক্ষই জেতার জন্য মাঠে নামে। একজন জেতে, অন্যজন পারে না। এগুলো সবই বাস্তব। কিন্তু বারবার যদি দুর্দান্ত খেলেও নক আউটে উঠে হারতে হয় আমাদের, তবে বুঝতে হয় সমস্যা টেকনিকে নয় - মানসিকতায়। টেম্পারমেন্টে। ১৪০ কোটির পাহাড় প্রমাণ চাপ নিতে না পারার হীনমন্যতায়। আর দেশের মধ্যে এখনও থেকে যাওয়া 'সর্ষেভূত'দের দেশদ্রোহিতায়।

এই সর্ষেভূতরাই রাজনীতির ময়দান করে তুলতে চেয়েছিল এবারের বিশ্বকাপকে। মহম্মদ শামি ছিল তাদের নোংরা খেলার প্রথম অস্ত্র। মহম্মদ শামি এবারের বিশ্বকাপের সব থেকে বেশি উইকেট নেওয়া বোলার। সবথেকে সফলও। আপামর ভারতীয়ের চোখের মণি শামি। ছেলেটার এই দীর্ঘ কেরিয়ারে জাতীয়তাবাদীরা কেউ তার ধর্ম দেখেনি। বরং খারাপ সময়ে দেশ আর দল তার পাশে দাঁড়িয়েছে। তাই চোট থেকে ফেরার পর অন্য অনেকের মত তাকে রঞ্জি খেলে নিজেকে প্রমাণ করতে হয়নি। সরাসরি সে চান্স পেয়েছে ভারতীয় দলে। অন্য অনেকের ক্ষেত্রে বধূ নির্যাতনের মামলা হওয়ার পর খেলার সুযোগটুকুও পেত না। শামি পেয়েছে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে পেয়েছে। কেউ এখানে তার ধর্ম দেখেনি। দেখেছে পরিশ্রম আর প্রতিভা। একইভাবে শামির গ্রামে ক্রিকেট স্টেডিয়াম করার সময় যোগী সরকার ভাবেনি শামি হিন্দু নাকি মুসলিম। অপরদিকে ফাইনালে হারের পর ড্রেসিংরুমে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। ধর্ম বিচার না করে সেখানে শামিকে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নেন তিনি। খোদ শামি নিজে ট্যুইট করে একথা জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু এসব কিছুই মুখ বন্ধ করতে পারেনি ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষ বাম সমর্থক আর মুষ্টিমেয় দেশবিরোধীদের। শামি দুর্দান্ত বোলিং করার পরই শুরু হয়ে যায় তাকে মুসলিম হিসেবে (ভারতীয় নয় এমন ভাব) প্রচার করার সাম্প্রদায়িক খেলা। চলতে থাকে

বিরাট কোহলি- আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা।

ফাইনাল ম্যাচ শেষে ভারতীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শামিকে বঞ্চিত দেখিয়ে দেশ এবং সরকারকে ছোট করার মিথ্যে প্রোপাগান্ডা। শামির স্ত্রী হাসিন জাহান বধূ নির্যাতনের সাথে সাথে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ এনেছিল তার বিরুদ্ধে। সরকার বা ক্রিকেট প্রশাসন তাতে বিশ্বাস করেনি। তাই টেস্ট হোক বা ওয়ান ডে, তাকে খেলিয়ে গেছে ক্রমাগত। উল্টোদিকে ছদ্মধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী তথা বাম-তৃণমূল তখন শামির বিপক্ষে গিয়ে তাকে গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছিল। আজ তারাই রাষ্ট্রের কাঁধে মিথ্যে অপবাদ চাপিয়ে সাধু সাজার চেষ্টা করছে। যদিও আপামর ভারতবাসীর কাছে চোরদের সাধু সাজার এই অপপ্রয়াস নতুন নয়। তাই এবারের খেলায় নতুন কিছু চেষ্টা করছে এই দেশবিরোধী লবি। মাঠে ফিলিস্তিনি সমর্থক ঢুকিয়ে সন্ত্রাসবাদের পক্ষে রাজনৈতিক বার্তা দেওয়ার জঘন্য চেষ্টা হোক বা বিদেশি অতিথিদের অপমান করে দেশকে ছোট করা - প্রচেষ্টা তাদের অব্যাহত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাজনীতির ময়দানে গো-হারা হেরে খেলার মাঠে নোংরা রাজনীতি করতে আসা রাষ্ট্রবিরোধীরা এবারেও সফল হয়নি।

আজ অবধি হওয়া সব বিশ্বকাপের মধ্যে সবদিক থেকে সফলতম এবারের বিশ্বকাপ। অসাধারণ ব্যবস্থাপনা মুগ্ধ করেছে সবাইকে। একটা সময় দেশে

অদম্য শামি।

বড় কোনো টুর্নামেন্ট হলে আতঙ্কে থাকতো সবাই। হোটেলের ঘরে সাপ বা বিড়াল ঢুকে যাওয়া, দেওয়ালের প্লাস্টার খসে পড়া বা বিদেশি অতিথিদের থাকার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এবারের বিশ্বকাপে অভিযোগ তো ওঠেই নি, উল্টে প্রশংসার সুর ঝরে পড়েছে সব দল এবং দেশের থেকে। কলকাতার মত কয়েক জায়গায় স্থানীয় পুলিশের গাফিলতিতে টিকিটের কালোবাজারি হয়েছে বটে, কিন্তু সেটাও অন্যবারের তুলনায় অনেকটা কম।

প্রশ্ন উঠতে পারে দেশ কী পেল! এর উত্তর দুটো। অর্থনৈতিক ও সামাজিক।

ভারতের প্রথম সারির এক ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী এই দেড় মাসে শুধু বিশ্বকাপ থেকেই দেশের আয় হয়েছে ২.৬ বিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ২২০০০ কোটি টাকা। এটা প্রত্যক্ষ আয়। যেমন বিজ্ঞাপন বা টিভিসত্ব বা টিকিট বিক্রির মত বিষয় থেকে। এর সাথে যুক্ত হবে বিমান ও ট্রেনের ভাড়া, হোটেল, দর্শকদের খাওয়া দাওয়া বা ঘোরার থেকে প্রাপ্ত কর যার হিসাব এক্ষুনি করে ওঠা কঠিন। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই বিপুল অর্থ আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের এগিয়ে যাওয়ার রাস্তায় ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে।

সামাজিক ক্ষেত্রে যদিও এই বিশ্বকাপের প্রভাব আরো অনেক অনেক বেশি।ওই দেড় মাসে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে (অবশ্যই কিছু ব্যতিক্রমী দেশবিরোধী ছাড়া) সমাজের সকল স্তরের মানুষ মেতে উঠেছিল দেশপ্রেমের এক অভূতপূর্ব আনন্দোৎসবে। আর্থিক ভেদাভেদ বা সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের উর্ধ্বে উঠে একটাই জাতীয় পতাকার নীচে এক হয়ে গিয়েছিল একটা গোটা দেশ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী কেউ যেন এক সুতোর বাঁধনে গেঁথে দিয়েছিল নিখুঁতভাবে। পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে যেন অদ্ভুত এক মিলনগীতি বেজে চলেছিল সারাক্ষণ। আর সেই গানেরই শেষ অধ্যায় লিখে দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

ফাইনালের দিন প্রধানমন্ত্রী যখন নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী স্টেডিয়ামে এলেন তখন অস্ট্রেলিয়ার জয় মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে। তিনি জানতেন বিজ্ঞানমনস্ক বলে নিজেদের পরিচয় দেওয়া বিরোধীরা তাঁকে অপয়া কুপয়া বলে গালাগালি দেবে। তবু তিনি এলেন। এলেন, কারণ নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে দূরে সরে যাওয়া তাঁর চরিত্রে নেই। আগের কোনো প্রধানমন্ত্রী করেননি ঠিকই, কিন্তু মানসিকভাবে ভেঙে পড়া দলের পাশে দাঁড়ানোটাই তো অভিভাবকের কাজ! নয়তো বিজয়ীর সঙ্গে ছবি তুলতে তো সবাই পারে। ম্যাচের পর প্রধানমন্ত্রী গেলেন ড্রেসিং রুমে। সাহস দিলেন, সান্ত্বনা দিলেন। বিরাট কোহলি আর রোহিত শর্মার হাত ধরে বুঝিয়ে দিলেন তিনি সঙ্গে আছেন। মহম্মদ শামিকে বুকে টেনে বুঝিয়ে দিলেন পাশে থাকার বার্তা। নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ করলেন পরবর্তীতে কোনো এক সময়ে। সারা দেশ দেখলো এটা। বুঝলো লড়াই করেও আমরা সাময়িক হারতে পারি। কিন্তু হারার পরও দেশ আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। আর এটাই উঠে দাঁড়ানোর আসল বার্তা।

দ্বিতীয় চন্দ্রযান মিশনের সাময়িক ব্যর্থতায় বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়েছিল দেশ। সাফল্য এসেছে চার বছর পর। আবারো খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়ে একটা গোটা জাতি। চার বছর পর সাফল্য শুধু সময়ের অপেক্ষা।

প্র্যাকটিস জার্সিতে বিরাট - রোহিত।

ছবিতে খবর

তিন রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের পর বিজেপির রাজ্য অফিসে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

'শাসকের প্রতিহিংসার বিধান' স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় ড. আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে বিজেপির গণতান্ত্রিক প্রতিবাদ ধর্না অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

বিজেপির বিপুল জয় উপলক্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিজেপি কর্মীবৃন্দদের সঙ্গে বিজয় উৎসবে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপির অভূতপূর্ব জয় উপলক্ষ্যে বিধানসভার বাইরে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি পরিষদীয় দলের লাড্ডু বিতরণ।

জনজাতীয় গৌরব দিবসে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহারে আয়োজিত ফুটবল ম্যাচের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

বিজেপি শিলিগুড়ি (সাংগঠনিক জেলা)-র সাংগঠনিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী।

কলকাতার দুই দিনের লোকসভা বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গ উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) মাননীয় বি এল সন্তোষ জি, বিস্তারক বর্গের সঙ্গে যুক্ত কেন্দ্র-রাজ্য নেতৃত্ব এবং ১৩টি রাজ্যের লোকসভা বিস্তারক।

চন্দননগর তেলিনিপাড়ায় জগদ্ধাত্রী পুজোয় সাংসদ ও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা লকেট চট্টোপাধ্যায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা ভারতীয় মজদুর সংঘের বস্ত্রদান কর্মসূচিতে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

শ্রীশ্রী কালীপুজোর শুভ সূচনায় নন্দীগ্রামে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চার বিজয়া সম্মিলনীতে রাজ্য ও জেলা নেতৃত্ব।

আসানসোল দক্ষিন মন্ডল (৪)-এর পুরাতন এগারায় মা কালীর বিসর্জন অনুষ্ঠানে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল।

বালুরঘাট বিধানসভার ভাটপাড়া অঞ্চলের ভুষিলায় আদিবাসী সমাজের সঙ্গে নবান্ন উৎসবে বিজেপি বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ী।

দক্ষিণ দিনাজপুর সাংগঠনিক জেলার হরিরামপুরে কালীপুজোর শুভ উদ্বোধনে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

খড়িবাড়ির ডুমুরিয়ায় জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপনে বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্তা।

কলকাতা উত্তর শহরতলি জেলা বিজেপির 'চোর ধরো জেল ভরো' বিক্ষোভ মিছিলে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

ফালাকাটার বিজেপি কার্যকর্তা শ্রী নিতাই সরকারের বাসভবনে শ্রী শ্রী রাধাগোবিন্দের মহাভোগ সকলের সঙ্গে বসে গ্রহণ করলেন রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মন।

মালদায় মনসা গানে মুখরিত আসরে ইংরেজবাজারের বিজেপি বিধায়িকা শ্রীরুপা মিত্র।

পুরুলিয়ায় কাসাই নদীর ধারে ছট পুজোর ঘাটে রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো।

নন্দকুমারে শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ উদ্বোধনে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

মসলন্দপুরে তফসিলি নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ করে খুনের প্রতিবাদে এবং অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশে বিজেপি তফসিলি মোর্চার রাজ্য সভাপতি সুদীপ দাস সহ জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীবৃন্দ।

বাঁকুড়ার গঙ্গাজলঘাটির নিধিরামপুরে তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের হাতে নিহত বিজেপি কার্যকর্তা শুভদীপ মিশ্রর পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডাঃ সুভাষ সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে বঞ্চিত উপভোক্তাদের অধিকারের দাবিতে জয়নগর সাংগঠনিক জেলার জামতলা বাজারে বিশাল জনসভায় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে বঞ্চিত উপভোক্তাদের অধিকারের দাবিতে দক্ষিণ ২৪ পরগণার রায়দিঘিতে বিশাল জনসভায় রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার সহ রাজ্য-জেলা নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দ।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সরকারের লাগামহীন দুর্নীতি এবং দুর্নীতিবাজ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্ত্রিসভা থেকে বহিষ্কার ও শাস্তির দাবিতে কুচবিহারে বিক্ষোভ মিছিল।

হিঙ্গলগঞ্জের যোগেশগঞ্জ অঞ্চলে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রতিবাদ মিছিল ও পথপ্রচার।

বর্ধমান জেলা বিজেপি তফসিলি উপজাতি মোর্চার উদ্যোগে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির উদ্যোগে, তপন বিধানসভার দাড়াল হাটে জনজাতীয় গৌরব দিবস উদযাপন।

বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার গাইঘাটা (২) মন্ডলের শুটিয়া অঞ্চলে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি।

গাজল বিধানসভার গাজল বিডিও অফিসের সামনে তৃণমূল সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপির অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

রাজ্যজুড়ে সর্বস্তরে তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিজেপি শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার ৪ ও ৫ নং মন্ডলের যৌথ উদ্যোগে রিষড়া পৌরসভায় অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি।

আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ

গণিতজ্ঞ আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ

হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির বাঙালি আইকন — স্বাভিমানী বাঙালি

বিনয়ভূষণ দাশ

বাংলায় বাঙালীর দল কোনটি? বিজেপি 'গুজরাতিদের দল' একথা শুনলে ঘোড়াও হাসবে। তৃণমূলের শত্রুঘ্ন সিংহ, সরলা মাহেশ্বরী, শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিমরা আদতে 'বাহারি', বাঙালি নয়। বামেদের উপাস্য নেতারা আবার সবাই বিদেশি ! কংগ্রেস বা তৃণমূলের আদর্শ নেতা গান্ধী, নেহরু, ট্যান্ডন সবাই অন্য প্রদেশের। একমাত্র বিজেপিরই মূল প্রোথিত আছে বাংলায়। ভারতীয় জনতা পার্টি বা তার পূর্বসূরি জনসংঘ গঠনের তাৎক্ষণিক কারণই ছিল বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের উপর অবিচারের প্রতিকার করা; তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করা। আর এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ।

বেশ কিছুদিন যাবত সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ওলটালে মনে হচ্ছে আমাদের এই রাজ্যে স্বাভিমানী, শিক্ষিত বাঙালির বড়ই আকাল পড়েছে রাজনীতির ক্ষেত্রে। বাঙালি আইকন খুঁজে পাচ্ছেন না রাজনীতিবিদরা। একদল রাজনীতিবিদ, যারা বাম রাজনীতির চর্চায় মগ্ন ছিলেন বা আছেন তাঁরা ভারতীয় বা বাঙালি রাজনৈতিকদের মধ্যে কোন আইকন খুঁজে পাননি। ফলে তাঁরা চিরকাল বিদেশিদের মধ্যে - মার্ক্স, লেনিন, স্তালিনদের মধ্যে আইকন খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁরা মার্ক্স, লেনিন, স্তালিনদের বাংলার রাজনীতিতে আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; ফলশ্রুতিতে দীর্ঘমেয়াদি রাজনীতিতে অপাঙক্তেয় পরিগণিত হয়েছেন তাঁরা। অবশ্য ইদানীং তাঁদের আর মার্ক্স, লেনিনদের নিয়ে বেশি হইচই করতে দেখা যাচ্ছে না ! যাঁদের একসময় গালাগাল করেছে, ঢোক গিলে এখন তাঁদেরই মধ্যে বামেরা আইকন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির কথা। বিজেপি বিরোধীদের মতে, বিজেপির নাকি কোন শিক্ষিত, বাঙালি আইকন নেই। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের কথা না হয় বাদই দিলাম; আরও যে অনেক বিদগ্ধ, উচ্চশিক্ষিত বাঙালি বিজেপি তথা জনসংঘর সাথে জড়িত ছিলেন সেকথা কি ওঁরা জানেন না ! একসময় তো বাংলার উচ্চ শিক্ষিত, রুচিশীল বাঙালি মাত্রই হিন্দু মহাসভা অথবা জনসংঘর সাথে যুক্ত ছিলেন তাও কি এঁরা জানেন না ? অথচ বিখ্যাত সাংবাদিক, 'প্রবাসী'ও 'মডার্ন রিভিউ'পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী, বিখ্যাত ব্যারিস্টার নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, লেখক সত্যচরণ শাস্ত্রী, উদ্বাস্তু আন্দোলনের নেতা মহাদেব ভট্টাচার্য, কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীশচন্দ্র নন্দী, দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত প্রথিতযশা বাঙালি বিভিন্ন সময়ে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আজ এমনই একজন উচ্চশিক্ষিত, জনসংঘর সাথে যুক্ত মানুষের কথা বলব। তিনি প্রখ্যাত বাঙালি গণিতজ্ঞ, ভাষাতত্ত্ববিদ,আইনজ্ঞ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, অধ্যাপক আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ।

মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি রিপন কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অখণ্ড বাংলার বরিশালের গাভা গ্রামের বিখ্যাত ঘোষ দস্তিদার পরিবারের সন্তান। তাঁর পিতা ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ছিলেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক আর মাতা অন্নদাসুন্দরী দেবী ছিলেন কবি। তাঁর ভাই সত্যব্রত ঘোষ এবং বোন শান্তিসুধা ঘোষ ছিলেন প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী। এই ধরনের এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সন্তান দেবপ্রসাদ সমস্ত পরীক্ষাতেই প্রথম হয়েছেন; কখনও তিনি দ্বিতীয় হননি। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি অঙ্কশাস্ত্রে এম এ পাশ করেন।এই পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের জন্য তাঁকে 'আধুনিক যুগের রামানুজম'আখ্যায় ভূষিত করা হয়।পরবর্তীকালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে গণিতের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেন এবং পরে ওই কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন।১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'সারভেন্ট'পত্রিকায় তিনি কিছুকাল সাংবাদিকতা করেন। কিছুকাল তিনি হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসেবেও কাজ করেন। তিনি বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ হিসেবে সমাদৃত ছিলেন। বাংলা ভাষা ও বানান নিয়ে কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর পত্র-বিতর্ক শিক্ষিত মহলে একসময় যথেষ্ট আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। তিনি অধ্যাপনা ছাড়াও আরও কয়েকটি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর লেখা 'বাঙ্গালা ভাষা বানান'পুস্তকটি বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়াও 'হিন্দু কোন পথে', 'সতের বৎসর পরে', 'তরুণিমা', ' Shifting Scenes' ইত্যাদি পুস্তক তিনি রচনা করেছেন।

মধ্যবয়সে আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ।

ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই সুবক্তা অধ্যক্ষ ঘোষ ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কয়েক বৎসর আগে, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাসভায় যোগদান করে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। পরে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে নতুন প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জনসংঘের সদস্য হন। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে তিনি রাজ্যসভার সদস্যপদ লাভ করেন। বেশ কয়েক বৎসর তিনি ভারতীয় জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন আর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার সভাপতি ছিলেন দীর্ঘদিন। তিনি তিনবার ভারতীয় জনসংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।প্রথমবার ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দ অবধি, দ্বিতীয়বার ১৯৬২ সালে এবং তৃতীয় বার ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। তিনি ছিলেন ভারতীয় জনসংঘের দ্বিতীয় বাঙালি সর্বভারতীয় সভাপতি। শুধু তাই নয়, ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি বাঙালি নেতৃত্ব দেওয়া কোন বাঙালি নেতা।তাঁর সভাপতিত্বকালে দেশে লোকসভার দুটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়; ১৯৫৭ এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর সভাপতিত্বকালে দল যথাক্রমে ৪ টি এবং ১৪ টি আসন লাভ করে। ১৯৬২ সালের নির্বাচনে দলের আসনসংখ্যা ৪ থেকে বেড়ে ১৪ হয়; অর্থাৎ লোকসভায় দলের অনেকটাই শক্তিবৃদ্ধি হয়।তাঁর সভাপতিত্বকালে, ১৯৫৭ সালে মধ্যভারতের বিলাসপুরে ১১ দিনের এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৮ সালে তাঁর সভাপতিত্বে আম্বালায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে নির্বাচন সংস্কারের বাঙালি করা হয়। ১৯৫৮ তেই নেহরু- নুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং জলপাইগুড়ির বেরুবারি ইউনিয়ন পাকিস্তানকে হস্তান্তরিত করে নেহরু সরকার। বেরুবারি রক্ষা করতে তাঁর নেতৃত্বে দেশজুড়ে বিক্ষোভ-আন্দোলন করে বাঙালি ও জনসংঘ কর্মীগণ।

১৯৫৯ সালে তিব্বতের স্বাধীনতার দাবিতে বৎসরব্যাপী জনজাগরণ বর্ষ' পালিত হয়। ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ' তিব্বত কনভেনশনে'সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,'Nehru should have taken a much stronger attitude in 1950-51 when China was overrunning Tibet; and his pact with China in 1954 setting his

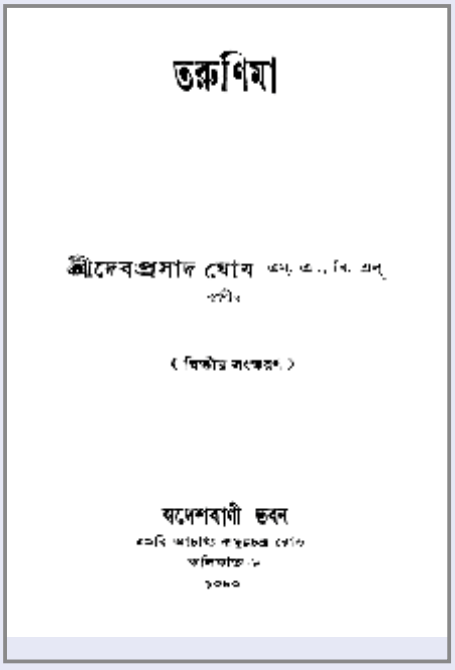

জনসংঘের দলীয় পতাকা ১৯৫১

seal of approval on the Chinese occupation of Tibet , and handing over Indian outposts and instalations in Tibet ---not to the Tibetans but to the Chinese aggressor—was as disgraceful as it was foolish.' প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর তিব্বত নীতির সারবত্তাহীনতার বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। এছাড়াও তিনি দিল্লীতে চিনা দূতাবাসের সামনে ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চের ৩০ তারিখ এক বিশাল প্রতিবাদ-সমাবেশের আয়োজন করেন। এবং ৪ই এপ্রিল কলকাতার চিনা কনস্যুলেটে এ বিষয়ে একটি প্রতিবাদপত্র দাখিল করেন। তিনি এ বিষয়ে লাগাতার সভাসমিতির আয়োজন করেন। দেশে একনায়কতান্ত্রিক প্রবণতার বিরুদ্ধে এবং বাকস্বাধীনতা ও শিল্প-সাহিত্যের স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তিনি বক্তব্য রাখেন। ১৯৫৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত দলের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন,' Logically and inevitably, socialism leads to totalitarian state of the monolithic type—in which one party reigns supreme, all activities of the state are controlled by the party, elections become a farce and a mockery , and all initiative and erterprise banned.' ওই ভাষণে তিনি আরও বলেন, 'এমনকি শিল্প ও সাহিত্য রাষ্ট্র নির্দেশিত এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বাকস্বাধীনতা,সংগঠিত হওয়ার স্বাধীনতাও স্বীকৃত হয়না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আসলে হয়ে পড়ে ক্রীতদাসরাষ্ট্র আর সমাজতন্ত্র যদি আদৌ কোন সাম্য আনে সেটা হল ক্রীতদাসবৃত্তির সাম্য'। তিনি ছিলেন ভারতীয় জনসংঘ তথা বিজেপির অন্যতম প্রধান বাঙালি 'আইকন'। তাঁর সভাপতিত্বকালে জনসংঘে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে কিছু সমসাময়িক রাজনৈতিক বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে। বিজেপি-বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষকরে তৃণমূল, বিজেপি দলটিকে বাংলা তথা বাঙালি বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করতে সতত প্রয়াসী। বিশেষ করে তাঁরা বিজেপিকে গুজরাতিদের দল হিসেবে দাগিয়ে দেবার চেষ্টা করছে! যদিও বিজেপির কেন্দ্রীয় দলে কজন গুজরাতি নেতা আছেন তা লাখ টাকার প্রশ্ন! অবশ্য এ প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় ওই দলগুলি ভুলে যায় যে, শত্রুঘ্ন সিংহ, সরলা মাহেশ্বরী, শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম এঁরাও আদতে 'বাহারি', বাঙালি নয়। বরং বিজেপি বিরোধী দলগুলির 'আইকন' নেতাগণ প্রায় সবাই বাংলার বাইরের। বামেদের উপাস্য নেতারা তো আবার সবাই বিদেশি ! কংগ্রেস বা তৃণমূলের আদর্শ নেতা গান্ধী, নেহরু, ট্যান্দন এঁরা সবাই অন্য প্রদেশের। বরং একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, ওই দলগুলি নয়, বিজেপিরই মূল প্রোথিত আছে বাংলায়। ভারতীয় জনতা পার্টি বা তার পূর্বসূরি জনসংঘ গঠনের তাৎক্ষণিক কারণই ছিল বাঙালি হিন্দু উদ্বাস্তুদের উপর অবিচারের প্রতিকার করা; তাঁদের অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন করা। আর এই অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সার্থক উত্তরাধিকারী ছিলেন আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষ। তিনি নিজে ছিলেন বাঙালি স্বাভিমানের প্রতীক; আন্দোলন করেছেন বাঙালি স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায়। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বা আচার্য দেবপ্রসাদ ঘোষের মত এত উচ্চশিক্ষিত, বিদ্বান মানুষ বাংলা থেকে আর কোন দলকে নেতৃত্ব দেননি। তিনি শ্যামাপ্রসাদের মতই ছিলেন শিক্ষাজগতের মানুষ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির উপাসক। বাঙালির সার্বিক অবক্ষয় তাঁকে রাজনীতিতে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি ছিলেন দ্বিতীয় বাঙালি নেতা যিনি দলকে সর্বভারতীয় স্তরে দীর্ঘদিন নেতৃত্বদান করেছেন। সুতরাং বিজেপি গুজরাতিদের দল একথা শুনলে ঢাকাইয়া কুট্টির ভাষায় কওন যায় 'আর কইয়েন না কত্তা, ঘুড়ায় হাসবো'।

বাঙালির কালীপূজা

কৌশিক কর্মকার

"আমার কাছে কালী মাংস, অ্যালকোহল খান এমন দেবী। তারাপীঠে গেলে দেখবেন সাধুরা ধূমপান করছে...", তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেছিলেন। তাঁর সীমিত জ্ঞানের পরিসর এবং মনের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি কোটি কোটি হিন্দুর কল্যাণময়ী জগদজননী মা এবং মায়ের সাধনভূমিকে ভোগের আদলে দেখেছেন, ওইটুকুই তাঁর দেখার ক্ষমতা। তিনি জানতেন না কেন স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং ব্রাহ্ম হয়েও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অধীর হয়ে উঠেছিলেন তারাপীঠের কালীভক্ত মহাসাধক বামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য। সত্যিই তো কি আছে কালী এবং কালী সাধনায়? কেন বাংলায় এত জনপ্রিয় মা কালী এবং কালী পূজা?

কালী পূজা বাঙালির সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিচিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রে যে দীপান্বিতা কালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তাই-ই জনমানসে সুচিহ্নিত হয়ে আছে কালী পূজা হিসেবে কারণ তার প্রসার ও প্রসিদ্ধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। তবে বাঙালির কালী পূজা একটি নির্দিষ্ট দিনে সীমাবদ্ধ নয়; বাঙালির সার্বিক মঙ্গল-অমঙ্গল বোধের সঙ্গে তা সংযুক্ত হয়ে আছে। পরিবারে যে কোন শুভ কর্মের আগে বাঙালি গৃহে কালীর বন্দনা হয়ে থাকে। তাছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয় বিবিধ কালী পূজা; মাঘ মাসে রটন্তী কালী পূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফলহারিণী কালী পূজা, বছরের যে কোন সময়ে রক্ষাকালী পূজা, শ্মশান কালী পূজা ইত্যাদি। বাংলায় কালী পূজার ঐতিহ্য যে সুপ্রাচীন তা অনুধাবন করা যায় বাংলার স্থাননামের দিকে নজর রাখলেও; সারা বাংলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এমন অজস্র গ্রাম জনপদ; যার নামে যুক্ত হয়ে আছে কালী নামের অনুষঙ্গ; যেমন: কালীপুর, কালীনারায়ণপুর, কালীনগর, কালীতলা, কালীঘাট ইত্যাদি। আবার অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থান নামের প্রেক্ষিতেও গড়ে উঠেছে কালীক্ষেত্রের

নাম; যেমন: ঢাকেশ্বরী, যশোরেশ্বরী, কিরীটেশ্বরী, করুণাময়ী ইত্যাদি। কেবল বাংলা নয়, বাংলার বাইরেও সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে এহেন অযুত অজস্র কালীক্ষেত্র।

বর্তমানে যে রূপে কালী পূজা হয়, ধরে নেওয়া হয় তার প্রথম উদ্গাতা ছিলেন শ্রী কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। কৃষ্ণানন্দ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণের মানুষ। তাঁর আদি নিবাস ছিল রাজশাহী জেলায়। পাঠান শাসনের সেই যুগে কৃষ্ণানন্দ বিধর্মীদের অত্যাচারে স্বদেশ ছেড়ে নবদ্বীপে চলে আসতে বাধ্য হন। ডিহিদার মামুদ শরীফের অত্যাচারে 'অভয়ামঙ্গল' রচয়িতা মুকুন্দরাম যেমন তাঁর পৈতৃক গ্রাম দামুন্যা ছেড়ে মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করেছিলেন, তারই অনুবৃত্তি লক্ষ করা যায় এক্ষেত্রে। অর্থাৎ মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকেই হিন্দুদের পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে অন্যত্র অভিবাসনের একটি প্রবণতার সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। কৃষ্ণানন্দ স্বহস্তে কালী মূর্তি গড়ে নবদ্বীপে কালী পূজা শুরু করেন। কৃষ্ণানন্দের পরিচয়ে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কালীমায়ের নাম হয় আগমেশ্বরীদেবী ও নবদ্বীপের সংশ্লিষ্ট অঞ্চল হয়ে ওঠে আগমেশ্বরীতলা। কৃষ্ণানন্দের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে ব্রহ্মানন্দ গিরি ঢাকার রমনা কালী মন্দিরে শক্তি সাধনা করেন। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের অভিশপ্ত রাত্রে পাকিস্তান সেনা এই প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী মন্দিরটিকে সম্পূর্ণ ধুলিসাৎ করে দেয় ও মন্দির চত্বরে এক ঘন্টার মধ্যে অন্তত একশো জন মানুষকে হত্যা করে। পাঠান-মুঘল আমল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত হিন্দুর মন্দির-উপাসনালয়ে এহেন আক্রমণ সংঘটিত হয়ে চলেছে ধারাবাহিকভাবে।

মা আগমেশ্বরী দেবী।

নদিয়া-রাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময় কালী পূজা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। তাঁর নির্দেশনায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় কালী পূজার সংখ্যা প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এর সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতকে সূত্রপাত হয় এক অপূর্ব সাহিত্যসম্ভারের যা শাক্ত পদাবলী বা শ্যামা সঙ্গীত নামে পরিচিত। মূলত বিত্তশালী, জমিদার, বণিক, মহাজন শ্রেণির কলমে তার সূচনা ঘটলেও এই গানের সুর স্পর্শ করে আপামর বাঙালির অন্তরকে। তাই আজ, একুশ শতকের আধুনিক যন্ত্রসর্বস্ব সময়েও শ্যামা সঙ্গীতের মাধুর্য তথা জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র ম্লান হয়নি; তা সমগ্র বাঙালি জাতিকে মথিত করে রেখেছে। শাক্ত পদাবলীর পরিসরে পাঠক খুঁজে পায় আত্মদর্শনের রূপরেখা, জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর; ভোগে নয়, ত্যাগে ও চূড়ান্ত আত্মসমর্পণেই যে মানুষের মুক্তি তা বাংলার নিজস্ব উপমা, রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ পেল শাক্ত পদাবলীর পংক্তিতে; এসময়ে রচিত হল অসংখ্য শাক্ত পদ তথা শ্যামা সঙ্গীত। অভাবী দরিদ্র বাঙালি জাতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিফলন ঘটল শাক্ত পদে, উপেক্ষিত বঞ্চিত মানুষ নিজেকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হল।

শ্মশান কালী : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের হাত ধরে বর্তমান ধরনের কালী পূজা অর্থাৎ দক্ষিণা কালী পূজার প্রচলন ঘটলেও বা অষ্টাদশ শতকে রামপ্রসাদ কমলাকান্তসহ আরও অজস্র পদকর্তার কলমে শাক্ত পদ রচিত হলেও কালীতত্ত্বের উৎস হল তন্ত্র শাস্ত্রে যা সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় অধিষ্ঠিত। ড: নীহার রঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন: 'আগম শাস্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন এবং তাহা সর্বভারতীয়; কিন্তু তন্ত্র বলিতে পরবর্তীকালে আমরা যাহা বুঝিয়াছি তাহা বোধহয় পূর্ব ভারতে, বিশেষভাবে বাংলাদেশেই সৃষ্টি ও পুষ্টিলাভ করিয়াছিল।' এবং 'এই সচেতন যোগসাধন আরম্ভ হইয়াছিল গুপ্ত আমলেই, কিন্তু পূর্ণরূপ গ্রহণ করিল পাল আমলে; এবং বাংলাদেশে তাহা এক বৃহত্তর সমন্বয়ের আশ্রয় হইল আর্যেতর এবং মহাযান-বজ্রযান-তন্ত্রযান-বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তায় যুক্ত হইয়া। এই সমন্বিত এবং সমীকৃত সংস্কৃতিই বাঙালীর সংস্কৃতির ভিত্তি, এবং ইহা পাল আমলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। সমন্বয় ও সমীকরণের এই রূপ ও প্রকৃতি অন্যত্র আর কোথাও দেখা যায় না।'[১]

তন্ত্র শাস্ত্র অতীব জটিল ও সাধনগত প্রকৃতির কারণেই তা গোপনীয়। এই কারণেই দুরূহ সাংকেতিক শব্দ ও সাধন ক্রিয়ার আড়ালে তা আবৃত। তাই তন্ত্র শাস্ত্রের গোপন গভীর দুর্ভেদ্য জটিলতার ব্যূহে প্রবেশ না করেও যা বলা যায় তা হল 'তন্ত্রের সবচেয়ে বড় কথা মাতৃভাবে দেবীর উপাসনা এবং এই উপাসনা করতে হবে নির্ভয় হয়ে। অভয়প্রতিষ্ঠ সাধকই যথার্থ বীরসাধক। মদ্য-মাংসাদিসেবী তথাকথিত বীরভাবালম্বী বীরসাধক নয়। এই বীরসাধক ছিলেন বীরেশ্বর বিবেকানন্দ যিনি ভীষণকে ভীষণতার জন্যই পূজা করতে চেয়েছিলেন, যিনি উপদেশ করেছিলেন তাঁর শিষ্যকে যে, যখন মায়ের কাছে প্রার্থনা জানাবে তখন 'মনে রেখো তিনি যেন তোমার প্রার্থনা শুনতে বাধ্য হন। মায়ের কাছে কোন আর্তভাব যেন প্রকাশ না পায়। স্মরণে রেখো।' এই তো যথার্থ বীরভাবের কথা।'[২]

এ কারণেই নির্ভীকতা ও বীরত্বের প্রতীক হয়ে ওঠে কালী পূজা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্পিত সশস্ত্র বিপ্লবীসমাজের দীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে কোন বৃহৎ পরিকল্পনার শুভ সূচনা ঘটত কালীমায়ের বন্দনার মাধ্যমে। স্বদেশী বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে সমার্থক হয়ে আছে অনুশীলন সমিতির নাম। অনুশীলন সমিতির নতুন কোন সভ্যের দীক্ষাগ্রহণ বা প্রতিজ্ঞাকরণ অনুষ্ঠিত হত দেবী মন্দিরে, তা হতে পারে রমনা কালীবাড়ি বা সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের মধ্যে প্রচলিত একটি গান এক্ষেত্রে উল্লেখ করা অবশ্য কর্তব্য; যে গানটির মধ্য দিয়ে তাঁদের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কালী বন্দনার সম্পৃক্ততা ঘোষিত হয়েছে উচ্চকণ্ঠে: 'শক্তি মন্ত্রে দীক্ষিত মোরা/ অভয়াচরণে নম্র শির।/ ডরি না রক্ত ঝরিতে ঝরাতে/ দৃপ্ত আমরা ভক্ত

বীর।/ আবাহন মার যুদ্ধ কারণে,/ তৃপ্তি তপ্ত রক্ত ক্ষরণে,/ পশুবল আর অসুর নিধনে/ মায়ের খড়্গ ব্যগ্র ধীর।/ মায়ের আরতি অরাতি নাশন,/ পদে অঞ্জলি বাঞ্ছা পূরণ/ শত্রুরক্তে মায়ের তর্পণ/ জবার বদলে ছিন্ন শির।।' বিপ্লবী সমাজের সাহস, শক্তি ও সর্বস্ব ত্যাগের আদর্শ ব্যঞ্জিত হয়েছে আলোচ্য গানটির মধ্য দিয়ে। অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের আদর্শের সূত্রে; বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে'র পঞ্চম অধ্যায় 'অনুশীলন' শীর্ষক অংশে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বলেছেন: 'কিছুই ধর্ম্মছাড়া নহে। ধর্ম্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্য জীবনের সর্ব্বাংশই ধর্ম্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না; এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ; কেবল হিন্দু ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ- সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?'[৩] বঙ্কিম তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেও দেখিয়েছেন অত্যাচারী মুসলিম শাসক রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সন্তান দল অস্ত্র ধারণ করেছে। এই সন্তান দলের আদর্শের উৎস কোথায় নিহিত? বঙ্কিমের মতে, দুষ্টের দমনের জন্য কেবল জীবন সমর্পণ করাই যথেষ্ট নয়; তার জন্য প্রয়োজন ভক্তি; আর এই ভক্তিই বিপ্লবী সমাজে উচ্চারিত হয়েছে মাতৃবন্দনারূপে। আনন্দমঠের আদর্শের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল অনুশীলন সমিতির সংবিধান: 'আনন্দমঠের আদর্শই ছিল সমিতিরও আদর্শ। দেশসেবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র রাষ্ট্রের অর্থ লুণ্ঠন অনুমোদন করেছেন। অনুশীলন সমিতিও সমাজদ্রোহীদের অর্থ বলপূর্বক গ্রহণ করা অনুচিত মনে করেন নি। সমাজদ্রোহীদের শাস্তি হবে এবং তাদের অর্থে দেশের কাজও চলবে। কর্মিগণও বিপদের ঝুঁকি নিতে শিখবে; সাহসিকতা ও সামরিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধন হবে।'[৪] মাস্টারদা সূর্য সেনের সুযোগ্য ছাত্রী কুন্দপ্রভা সেনগুপ্ত তাঁর 'কারা স্মৃতি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ভীষণাকার এক কালীমূর্তির সামনে নিজ রক্ত সমর্পণ করে তাঁদের প্রতিজ্ঞা নিতে হত। ভারত মায়ের বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বসুও ফাঁসির পূর্বে চতুর্ভূজার প্রসাদ খেয়ে বধ্যভূমিতে যেতে চেয়েছিলেন কেবল কালীবন্দনা বা কালীমায়ের পাদপদ্মে নিজের রক্ত সমর্পণ করে দলের প্রতি আজীবন বিশ্বস্ত থাকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ নয়, মায়ের মন্দির ও ভক্তদের রক্ষা করাও স্বদেশী যুগে বিপ্লবীদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী এমনই একটি ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন তাঁর গ্রন্থে: 'সাটিরপাড়ার নিকট চিনিশপুর কালীবাড়ী অবস্থিত। ইহা প্রসিদ্ধ পীঠস্থান। সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসে, কোন এক তিথিতে (অমাবস্যা), সেখানে হাজার হাজার লোক পূজা দিতে আসে। এই পূজায় চার-পাঁচশ পাঁঠা এবং পাঁচ-সাতটা মহিষ বলি পড়ে। একবার গুজব রটিল যে, এই পূজার দিন মুসলমানেরা কালীবাড়িটি আক্রমণ করিবে। আমি মফঃস্বল সমিতির সম্পাদকগণকে সংবাদ দিলাম, সেইদিন প্রাতে লাঠিসহ সকলকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। প্রায় পাঁচ শত স্বেচ্ছাসেবক ঐ দিন উপস্থিত হইল। প্রথমে তাহাদিগকে 'কুচকাওয়াজ' করাইলাম, পরে যাত্রীদের সুবিধার জন্য তাহাদের নানা কাজে বিভক্ত করিয়া দিলাম। সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা সেখানে উপস্থিত ছিলাম, কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই এবং যাত্রীরা সকলে বিদায় হইলে আমরাও প্রত্যাবর্তন করিলাম।'[৫] আলোচ্য ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় বাংলার বিপ্লবীসমাজের কাছে শক্তি বন্দনা কি অপরিসীম গুরুত্ব লাভ করেছিল!

সিদ্ধকালী : কালীর এই রূপ ভুবনেশ্বরী নামেও পরিচিত। কালী মায়ের সাধকেরা এই পুজো করে থাকেন।

ফলহারিণী কালী : গৃহস্থ বাড়িতে শান্তি বজায় রাখতে কালীর এই রূপকে আরাধনা করা হয়।

থিম পুজোয় ব্যস্ত বর্তমান প্রজন্ম কি অনুধাবন করতে পারবে বিবেকানন্দ বর্ণিত, স্বদেশী বিপ্লবী পূজিত সেই ভীষণ দেবীর আরাধনার তাৎপর্য? শ্রদ্ধাহীন পূজা গুরুত্বহীন; তা অকল্যাণকর। আজ থেকে সাত দশকেরও বেশি সময় পূর্বে, ১৯৪৯ সালে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লক্ষ করেছিলেন প্রতিমা তৈরিতে বিচ্যুতি ঘটছে: 'নগরে কালীপ্রতিমার জিহ্বা অতিশয় দীর্ঘ। দেখিলে মনে হয় যেন একটা কৃত্রিম জিহ্বা মুখে পুরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই জিহ্বা লক্লক্ করিতে পারে না। কালীপ্রতিমা-নির্মাণ অতিশয় কঠিন, যে সে শিল্পীর কর্ম নয়।'[৬]

আমরা অনায়াসেই বলতে পারি বর্তমানে এই বিচ্যুতি প্রবল আকার ধারণ করেছে; তা মাত্রাছাড়া পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। নানান কারণে দেবীর পূজা পদ্ধতিও যাচ্ছে বদলে; বিসর্জনের দিনক্ষণও তিথির বদলে নির্ধারিত হচ্ছে অনধিকারী নিয়ন্ত্রকের দ্বারা। আমরা ক্রমশ এগিয়ে চলেছি আদর্শহীনতার পথে, অন্ধকারসমাচ্ছন্ন এই আবহে নিষ্ঠা ও ভক্তিপূর্ণ মাতৃবন্দনাই হোক আমাদের পাথেয়।

তথ্যসূত্র:

১। স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ, 'বাংলার তন্ত্রসাধনা', স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ (সম্পা.), উদ্বোধন ১০০, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১২৬

২। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৯

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ), বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৫৪৩

৪। শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি, অনুশীলন সমিতি ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্যাপন কমিটি, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা ৫০

৫। শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী, জেলে ত্রিশ বছর ও পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম, মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী স্মৃতিরক্ষা কমিটি, কলকাতা, প্রকাশকাল অনুল্লিখিত, পৃষ্ঠা ৩০

৬। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, 'বারমাসে তের পার্বণ', ঈশানী দত্ত রায় (সম্পা.), আনন্দবাজার পত্রিকা প্রবন্ধ ও কবিতা শতবর্ষ সংকলন, এবিপি প্রা: লি:, কলকাতা, ২০২২, পৃষ্ঠা ২৯

ছট পুজো সকল ভারতীয় হিন্দুর সূর্য উপাসনা

সৌভিক দত্ত

ছট পুজো বা সূর্য উপাসনা কোনো একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয়। ছট পুজো সকল হিন্দু তথা সমগ্র মানবজাতিরই। ছট পুজোয় বাঙালী – বিহারি কোন বিভেদ নেই। এই বিভেদ আসলে তৈরি করেছে জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু বিরোধী 'অল্পবিদ্যা'-র বামৈশ্লামিক দেশবিরোধীরা। তাঁদের কাছে ভারতীয় হিন্দুদের মধ্যে বাঙালি –বিহারি সমস্যা তৈরি করার অন্যতম অস্ত্র ছট পুজো। যদিও সূর্যদেবতা ও মা ষষ্ঠীর আরাধনাই হল ছটপুজো। ছট ব্রত আসলে ষষ্ঠী ব্রত। সূর্য ষষ্ঠীর ব্রত এবং উপবাস পালন। ছটি মাতা বা ষষ্ঠী দেবীর পুজোয় বাঙালি-বিহারির ভাগাভাগি অনেকটা 'বাংলায় মার্ক্সবাদ'-এর মতই অলীক কল্পনা।

ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী শক্তি,বিশেষত হিন্দুদের নিয়ে দেশবিরোধীদের ভয় চিরকালীন। কারণ হিন্দুরা যতদিন একত্রিত থাকবে ততদিন এই দেশকে ভেঙ্গে দেওয়া বা দখল করে নেওয়া তাদের জন্য এক কথায় অসম্ভব। আর তাই বিভিন্ন উপায়ে চলছে হিন্দুদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির খেলা। দুর্গাপুজো বনাম হুদুর দুর্গা, উত্তর ভারত বনাম দক্ষিণ ভারত, হিন্দি বনাম অহিন্দি, বিহারি বনাম বাঙালি - ইত্যাদি ইত্যাদি সমস্যা তৈরি করে দেওয়াটা তাদের অন্যতম যুদ্ধকৌশল। আর এই বাঙালি –বিহারি সমস্যা তৈরি করার অন্যতম অস্ত্রই হল ছট পুজো।

ছট পুজো কী? এক কথায় বলতে গেলে সূর্যদেবতা ও মা ষষ্ঠীর আরাধনাই হল ছটপুজো। আব্রাহামিক আগ্রাসন শুরু হওয়ার আগে, এমনকি মূর্তিপুজো শুরু হওয়ারও আগে সারা পৃথিবী জুড়ে যে প্রকৃতি উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তারই অন্যতম ধারক বাহক হল এই ছটপুজো। যদিও কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক তাও মূর্তিপুজোর প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে হিন্দুরা কিন্তু মূর্তি পুজো করে না। তারা মূর্তির মধ্যে চিন্ময়ীর মৃন্ময়ী রূপ দেয় মাত্র। প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে আর নিরঞ্জনের পরে মূর্তিগুলো সাধারণ মূর্তি ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

যাইহোক, যেখানে ছিলাম। ছট পুজো। কিছুটা হিন্দুদের নিজেদের অজ্ঞানতায় আর কিছুটা বামৈশ্লামিক প্রোপাগান্ডার ফলে যা শুধুমাত্র বিহারিদের উৎসব বলে পরিচিত। এই বিপজ্জনক ন্যারেটিভ ভাঙা অত্যন্ত প্রয়োজন।

আসলে ছট শব্দটা ষষ্ঠী নামের অপভ্রংশ। মূলত সূর্য ষষ্ঠী ব্রত হওয়ার দরুন একে ছট বলা হয়। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলি পালনের পর এই চার দিনের ব্রতের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন ও তাৎপর্যপূর্ণ রাত্রি হল কার্তিক শুক্লা ষষ্ঠী! বিক্রম সংবতের কার্তিক মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত উদযাপিত হয় বলে এর নাম ছট।

এই পুজোয় অর্ঘ্য অর্পণ করে কৃতজ্ঞতা জানানো হয় সূর্যদেব এবং তাঁর দুই স্ত্রী উষা আর প্রত্যুষাকে। এর পরে ষষ্ঠী দেবীকেও আরাধনা করা হয়। পবিত্র স্নান, উপবাস, দীর্ঘ সময় ব্যাপী জলপান থেকে বিরত থাকা, কোমর জলে দাঁড়িয়ে থেকে প্রার্থনা করা এবং প্রসাদ নিবেদন - এই আচারগুলি ভক্তিভরে পালিত হয়। জাতি, বর্ণ বা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি কোনও ভেদাভেদ করা হয় না এখানে। একদিকে পশ্চিমের দারুণ শৈত্যপ্রবাহ থেকে ভগবান সূর্য যাতে প্রাণরক্ষা করেন, এবং মা ষষ্ঠী যাতে গোত্রবর্ধন করেন, সেটাই এই ব্রতের উদ্দেশ্য।

বেলুড় মঠ গঙ্গার ঘাটে ছট পূজা।

সূর্যদেব তো পৃথিবীর সাক্ষাৎ ধারক ও বাহক। সূর্য আছে বলেই আমরা আছি। শক্তিচক্র হোক বা খাদ্যশৃঙ্খল কিংবা জলচক্র - সবকিছুরই মূলে আছে সূর্যের শক্তি। অন্যদিকে উষা অর্থাৎ একদম ভোর বেলায় সূর্যের প্রথম রশ্মি আর প্রত্যুষা অর্থাৎ গোধূলি বেলায় সূর্যের শেষ রশ্মি!

এছাড়াও ছটি মাতা বা ষষ্ঠী দেবীর পরিচয় নিশ্চয়ই আলাদাভাবে দিতে হবে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী, শ্রাবণ মাসে লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্র মাসে মন্থন ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে দুর্গা ষষ্ঠী, চৈত্র মাসে নীল ষষ্ঠী, শিশুর জন্মের পর 'সূতিকা ষষ্ঠী, ষষ্ঠ দিনে 'ঘাট ষষ্ঠী' ইত্যাদি ইত্যাদি রূপে অসংখ্যবার আমরা আরাধনা করি সন্তানদাত্রী ও তার রক্ষাকর্ত্রী এই দেবীকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে পাওয়া যায় যে প্রথম মনু, স্বয়ম্ভুর পুত্র রাজা প্রিয়ব্রতের কোন সন্তান ছিল না। তাই মহর্ষি কাশ্যপ রাজাকে পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করতে বললেন। যজ্ঞের ফলে রানি মালিনী একটি পুত্রের জন্ম দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত শিশুটি মৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। রাজপরিবারে যখন কান্নার রোল ওঠে তখন আকাশ থেকে একটি রথ মাটিতে অবতরণ করে, যাতে মাতা ষষ্ঠী বসেছিলেন। রাজা তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন যে তিনি ব্রহ্মার মানস কন্যা ষষ্ঠী দেবী। তিনিই পৃথিবীর সকল শিশুকে রক্ষা করেন এবং নিঃসন্তান দম্পতিদের সন্তান দেন। এর পরে দেবী মৃত শিশুর জীবন দান করলেন। আর তখন থেকেই সারা ভারতীয় সমাজে দেবী ষষ্ঠী বা ছটি মাইয়ার পুজো শুরু হয়।

তাহলে বলুন তো সূর্য, সূর্যের রশ্মি, ষষ্ঠীপুজো - এসবের ভেতর বাঙালি-বিহারি ভাগাভাগি করা যায় ঠিক কিভাবে? ইতিমধ্যেই বলেছি যে সূর্যের আরাধনা ইতিহাসের অন্যতম প্রাচীন আরাধনার মধ্যে একটি। সারা পৃথিবীজুড়েই দেখা গেছে সূর্যোপসনা।

বুশম্যান এবং পিগমিদের কাছে সূর্য হলো দেবতার চোখ। দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কামিলারই জনগোষ্ঠীর কাছে প্রধান সৃষ্টিকর্তার সন্তান সূর্য। পশ্চিম তিমুরে সৌরদেবতা উসি-নিনো আর পূর্ব তিমুরে সূর্যদেবতার নাম উপুলেরা। সেখানে সূর্য জীবনীশক্তি এবং উর্বরতার উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার অ্যারান্দা গোষ্ঠীতে আবার সূর্যকে নারী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর সেখানে সূর্যের অবস্থান কিছুটা আমাদের বুদ্ধের মতো। যে কেউ আত্মিক উন্নয়নের দ্বারা সূর্য হতে পারে বলে তাদের বিশ্বাস। অন্যদিকে কোরকুস গোত্রের বিশ্বাস, তারা সূর্য আর চন্দ্রের মিলনের ফসল।

আর প্রাচীন মিশরের ধর্মবিশ্বাস তো অন্য যে কোনও সংস্কৃতির চেয়ে সূর্য দ্বারা অধিক প্রভাবিত ছিল। সূর্যদেবতা পরিচিত 'রা' নামে। আমুন, আটেন কিংবা হোরাসের মতো দেবতাদের সাথে মিলিত হয়ে চলতো সূর্যের উপাসনা। আমুন-রা, রা-হোরাখতি, খনুম, আটেন-রা, মন্তু-রা নামগুলো তারই প্রমাণ বহন করে। যেহেতু সূর্য পৃথিবীর একপ্রান্তে অস্তমিত হয়ে অপর প্রান্তে উদিত হয়; রা এর সাম্রাজ্য তাই আদিগন্ত। সম্রাটরা এই দৃষ্টিকোণেই সূর্যের মতো অবিনশ্বর এবং সকলের উপর সার্বভৌম অভিভাবকে পরিণত হতেন। মোঙ্গলরা সূর্যদেবতা টেংরির পূজা করত। মেক্সিকোতে নিয়মিত বলি দেওয়া হত সূর্যদেবতার সন্তুষ্টির জন্যে। গ্রীসের সূর্যদেবতা ছিলেন হেলিয়স আর রোমে ছিলেন অ্যাপোলো।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়ে রাখি। প্রাচীন মেসোপোটেমিয়া সভ্যতায় সূর্য দেবতার নাম ছিল উতু। অন্যদিকে বাংলায় সূর্য পুজোর নাম ইতু পুজো। ইতু শব্দটি মিতু অর্থাৎ মিত্র থেকে এসেছে। মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। মেসোপটেমিয়ার সূর্যদেব উতুর সাথে বাংলার ইতুর কি কোনো সংযোগই নেই নাকি এটা নেহাতই কাকতালীয়? নাকি কোনো এক মহান ধর্মীয় সংস্কৃতি প্রাগৈতিহাসিক যুগে সারা পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত ছিল, আব্রাহামিক আগ্রাসনের ফলে যার শেষ ও একমাত্র উত্তরাধিকারী হল ভারত। যদি ভারতের এই বহুত্ববাদী ধর্মকে বাঁচানো যায় তবেই একমাত্র বেঁচে থাকবে সারা পৃথিবীর মুক্তচিন্তার উত্তরাধিকার।

আর ভারতের কথা তো বলাই বাহুল্য। সূর্য তথা সূর্যের শক্তি যে এই পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মূলে তা আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্পষ্টভাবেই অনুধাবন করেছিলেন। ঋগ্বেদের শ্লোকসমূহে সূর্য বন্দনার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

ছট পূজার নিবেদনে বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পল।

ঋগ্বেদের স্তোত্র ১.১১৫ তে সূর্যকে অন্ধকার দূরীকরণকারী, জ্ঞান, সু ও সর্বজীবনকে শক্তি প্রদানকারী হিসাবে দেখানো হয়েছে। তিনি আদিত্যগণের অন্যতম এবং কশ্যপ ও তাঁর অন্যতমা পত্নী অদিতির পুত্র। তাই তার অন্য নাম আদিত্য। সূর্য হলেন হিন্দুধর্মের প্রধান পাঁচজন দেবতার মধ্যে একজন, যাকে পঞ্চায়তন পূজার সমতুল্য দেবতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্মার্ত ঐতিহ্যে সূর্যকে ব্রহ্ম এর সমতুল্য মনে করা হয়। কৃষ্ণ যজুর্বেদে বলা হয়েছে, আদিত্যই বিশ্বের প্রাণ স্বরূপ, আদিত্য থেকেই প্রাণের সৃষ্টি।

ছট ছাড়াও মকর সংক্রান্তি, পোঙ্গল, সাম্বা দশমী, রথ সপ্তমী ও কুম্ভমেলার সাথে যোগ রয়েছে সূর্যের! হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রের রাশিচক্র পদ্ধতিতে সূর্য হল সিংহের অধিপতি। সূর্য বা রবি হল হিন্দু পঞ্জিকার রবিবারের অধিপতি। জ্যোতিষ শাস্ত্র ঠিক নাকি ভুল সেই তর্কে না গিয়েও বলা যায়, সূর্য উপাসনা শুধুমাত্র বিহারিদের হলে সারা ভারতজুড়ে প্রভাব বিস্তার করা জ্যোতিষে সূর্য এত গুরুত্বপূর্ণ হত না।

একইভাবে উষাও বৈদিক দেবী। বেদ অনুযায়ী তিনি হলেন পূর্বের দেবী

এবং অশ্বিনীকুমারদের মাতা। অগ্নি, সোম এবং ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতা সকলের পরে তিনি হলেন অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈদিক দেবী। রাত্রি হলেন তাঁর ভগ্নী যাকে হয়ত পরে পৌরাণিক যুগে সন্ধ্যা এবং ছায়ারূপে কল্পিত করা হয়েছে। উষা মাতৃকার পূজা হরপ্পা সভ্যতাতেও ছিল।

রামায়ণে আমরা পাই, রামের কুলদেবতা সূর্যের উদ্দেশ্যে রাম এবং সীতা সূর্য আরাধনা করেছিলেন। মহাভারতে আবার আমরা দেখি, সূর্যকে আরাধনা করে দ্রৌপদী অক্ষয় পাত্র লাভ করেছিলেন। রাজা পাণ্ডু ঋষি হত্যার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে যখন পত্নী কুন্তীর সঙ্গে বনে ছিলেন, তখন পুত্র প্রাপ্তির জন্য সরস্বতী নদীর তীরে সূর্য উপাসনা এবং ব্রত করেছিলেন। পুরাণমতে কৃষ্ণপুত্র শাম্ব সূর্যদেবের বরে কুষ্ঠরোগ থেকে মুক্ত হয়ে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে প্রাচীন মিত্রাবনে অর্থাৎ আজকের কোনারকে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও ইতিহাস মতে মন্দিরটি ১২৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব গঙ্গা রাজবংশের প্রথম নরসিংহদেব নির্মাণ করেছিলেন। তবে তাতে সূর্য উপাসনার মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং তা প্রায় ৮০০ বছর আগে তথাকথিত বিহারের সীমানার বাইরে সূর্য উপাসনার আরও পোক্ত প্রমাণ।

আর সঙ্গে মহাভারতের ট্রাজিক চরিত্র কর্ণ তো আছেনই। নিজেকে সূর্যপুত্র হিসেবে জানার বহু আগে থেকেই তিনি ছিলেন সূর্য উপাসক। কোমর পর্যন্ত জলে নেমে তিনি সূর্যের উপাসনা করতেন। আজও ছট পূজা উদযাপন করা হয় কোমর পর্যন্ত জলে নেমে। ইতিহাস আর সংস্কৃতি কখনোই বিলীন হয় না বরং এভাবেই জাতির শিরায় শিরায় বয়ে চলে।

রক্ষাকর্তা হিসাবে সূর্য উপাসনা আর গোত্রবৃদ্ধির জন্য ষষ্ঠীর উপাসনা নানাভাবে নানা স্থানে এইভাবে প্রচলিত ছিল এবং বর্তমানেও আছে! ইতিহাস ও দর্শন না জেনে তাকে নির্দিষ্ট কোনো সম্প্রদায়ের বলে চালিয়ে দেওয়া হয় নির্বুদ্ধিতা আর নয়তো দুষ্টচক্রের কাজ। কিংবা হয়ত একইসাথে এই দুইয়েরই পাল্লায় পরে ছট পুজো হয়ে দাঁড়িয়েছে বাঙালি-বিহারি বিভাজনের অন্যতম হাতিয়ার!

ফেক নিউজ

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া এক পরিসংখ্যানের দাবি দেশের অধিকাংশ খেলোয়াড়ই নাকি ব্রাহ্মণ। সেটাও ৮৫ শতাংশ অর্থাৎ এগারো জনের দলে গড়ে ন'জন নাকি ব্রাহ্মণ হয়। প্রথম কথা ভারতীয় দল জাতি বা ধর্ম দেখে খেলোয়াড়দের সুযোগ দেয় না। দ্বিতীয় এবং সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা এটা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা।

আসল খবর

মনসুর পতৌদি থেকে শুরু করে বিনোদ কাম্বলি হয়ে আজকের শামি অবধি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতির মানুষ একসাথে খেলেছে ভারতের ক্রিকেট দলে। ভারতের শেষ বিশ্বকাপের দলটার দিকেই নজর দিন। মূল একাদশের এগারোজন খেলোয়াড়ের মধ্যে দু'জন শিখ, দু'জন মুসলিম আর দু'জন অনগ্রসর যাদব সম্প্রদায়ের। এভাবে ফেক নিউজ ছড়িয়ে অনগ্রসর এবং তফসিলি সহ অন্য ধর্মের মানুষদের মনে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বিদ্বেষ তৈরি করাই এইসব বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনের আসল উদ্দেশ্য।

ফেক নিউজ

এবারের ক্রিকেট বিশ্বকাপের পরদিন সকালে সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে গেল প্রধানমন্ত্রী মোদী নাকি অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনের হাতে বিশ্বকাপ তুলে দিয়ে সোজা মুখ ঘুরিয়ে ফেরত চলে এসেছেন।

আসল খবর

আসল ভিডিওকে কেটে এমনভাবে বানানো হয়েছিল যাতে এটা সত্যি মনে হয়। যদিও আসল ভিডিও ইউটিউব সমেত অনেক জায়গাতেই মিলছে, বিনা পয়সায়। সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন সমেত সব খেলোয়াড়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী।

ফেক নিউজ

যে কোনো যুদ্ধই মানবসভ্যতার কাছে অভিশাপ। আর তার থেকেও বড় বিপদ যুদ্ধকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে দেওয়া প্রোপাগান্ডা আর মিথ্যে খবর। সঙ্গের ছবি সেটারই প্রমাণ। ছবিতে দাবি করা হয়েছে, গাজার এই অবস্থা করেছে ইজরায়েল।

আসল খবর

বাস্তব সত্য হল এটা ইরাকের ছবি। আইসিস যখন হত্যালীলা চালাচ্ছিল গোটা মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে, তখন এরকমই দুরবস্থায় জীবন কাটাচ্ছিল সাধারণ মানুষ। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আবাসন থেকে বাচ্চার প্রিয়তম খেলনা ফিরিয়ে নিতে গিয়েছিল এক হতাশাগ্রস্ত মা - তারই ছবি এটা, গাজার নয়।

ফেক নিউজ

হলুদ নাকি শরীরের জন্যে খারাপ। এই অদ্ভুত দাবিও আজকাল শুনতে হচ্ছে। মানুষের মনে বিভ্রান্তি তৈরি করতে ফেক 'গবেষণালব্ধ' তথ্য দেওয়া হচ্ছে মনগড়াভাবে।

আসল খবর

হলুদ মানবজাতির ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোগ নিরাময়কারী ও প্রতিষেধক এক পদার্থ। প্রাচীন কাল থেকে এর ব্যবহার বিবিধ। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের জগতেও ডাক্তার এবং বিজ্ঞানীদের অন্যতম পছন্দের প্রাকৃতিক ওষুধ এই হলুদ। আসলে দেশ এবং সনাতনী সংস্কৃতিকে ছোট করার প্রচেষ্টায় দেশের সব কিছুকে খারাপ বলতেই এরকম ফেক খবর ছড়ানো হয় বলে বিশেষজ্ঞদের মত।

২২ লক্ষের বেশি প্রদীপ জ্বালিয়ে সরযূ তীরে রাম জন্মভূমি অযোধ্যায় আলোকিত দীপোৎসব। সাক্ষী ৫৪ দেশের ৮৮ কূটনীতিক।

২৪ ডিসেম্বর কলকাতার 'লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ' সমাবেশে, প্রধানমন্ত্রীকে উপস্থিত থাকার আমান্ত্রণ জানাতে সনাতনী সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার।

হিমাচল প্রদেশের লেপচায় সেনা ঘাঁটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীপাবলি উদযাপন।

জনজাতীয় গৌরব দিবসে ঝাড়খণ্ডে বিরসা মুন্ডার গ্রাম উলিহাটুতে নরেন্দ্র মোদী। এই প্রথম দেশের কোনও প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা সংগ্রামী আদিবাসী নেতার গ্রামে গিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানালেন।

পর্যটকদের নতুন গন্তব্য অযোধ্যা

অযোধ্যা যখন বিশ্বের দরবারে

তৈরি হচ্ছে 'রামচরিত মানস এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার'

পর্যটকদের জন্য 'অযোধ্যা হাট'

পদ্মফুলের আকারে 'মেগা মাল্টিমিডিয়া ফাউন্ডেশন পার্ক

পর্যটকদের জন্য হচ্ছে 'জাদুঘর'

শুধু ধর্মীয় স্থান নয়, মোদীজির নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাচ্ছে অযোধ্যা

/BJP4Bengal bjpbengal.org

সূত্র: মিডিয়া রিপোর্ট

ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ শাখার পক্ষে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক টী.সি. দত্ত মার্চেন্টস প্রা.লি., কলকাতা - ৭০০ ০২৫ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।